ভারতের
জাতীয়
মুক্তি সংগ্রাম

শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ

শ্রীকমল বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

নূতন সংস্করণ, ১৩৯৩

মূল্য ঃ বারো টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ

এস. ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

বাংলায় ইংরাজদের আগমন (১৬৯০-১৭৭০)

• পলাশীর যুদ্ধ- নবাবী আমলের শেষ •

দু'শ' বছর আগেকার বাংলার পল্লীতে ছিল চালে চালে বাড়ি, বাগিচা আর দীঘি-ঘেরা গৃহস্থের সংসার। মাঠে মাঠে চলেছে হাল। নদীর বুকে সারি সারি নৌকা পাল তুলে চলেছে। ভাটিয়ালি গানের সাথে দাঁড় টানার ছন্দ! পাল-তোলা নৌকা পল্লীর সোনার ফসল নিয়ে যায় গঞ্জে গঞ্জে আর বন্দরে বন্দরে। ফিরে আসে বন্দরের সম্পদ নিয়ে।

দুপাশে পড়ে থাকত সোনার ফসলে ভরা প্রশান্ত প্রশস্ত মাঠ। পল্লীর কোলে পাতলা বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেত সাদা চকচকে ছাদের আলিসা, মন্দির-মসজিদের শুভ্র চূড়া—আর শোনা যেত প্রতি সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টা আর আজানের ধ্বনি।

স্বপ্নের মাঝে মিলিয়ে গেছে এসব ছবি।

কারা সর্বনাশ করলে সোনার বাংলার? কারা বাংলার বুকে নিয়ে এল শ্মশানের এই বিভীষিকা? কাদের শয়তানির মশালের আগুনে দুই শতাব্দীর মধ্যে পুড়ে ছারখার হ'ল বাংলার গরিমা? সোনার বাংলায় এসেছিল ইউরোপীয় লুটেরার দল। ইংরেজ এদের অন্যতম।

১৬১৬ সাল। ইংরেজ ডাক্তার ব্রাইটন সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে রোগমুক্ত করে নিজের স্বদেশীয়দের জন্য বিনা শুল্কে বাংলার সর্বত্র বাণিজ্য করবার আর কুঠি তৈরী করবার অধিকার পেল।

তারা চট্টগ্রাম দখলের জন্য গোপন আয়োজন করল। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁ তাদের বিতাড়িত করলেন। তারা গিয়ে লুটিয়ে পড়ল সম্রাট আওরংজেবের পায়ে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তারা বাংলায় ফিরে আসার অনুমতি পেল। কলকাতা আর কাশিমবাজার হল তাদের আড্ডা।

বাংলার সিংহাসনে তরুণ নবাব সিরাজ—দেশপ্রেমিক, কিন্তু অবিচক্ষণ, অকৌশলী। বিদেশী বণিক আর স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের মিলিত

শয়তানির ফলে ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার দেশভক্তরা প্রাণ দিল। সিরাজ মরল ঘাতকের হাতে।

পাপীর অধম মীরজাফর বসল সিংহাসনে। ইংরেজের অত্যাচারে ডাচদের সাথে চলল মীরজাফরের গোপন ষড়যন্ত্র। ইংরাজরা মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করল। দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারও অপসৃত হলেন। ইংরাজদের মোটা টাকা বকশিস্ দিয়ে বাংলার নবাবী নিলেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম। কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর চোখে স্পষ্ট হ'ল ইংরাজ বণিকদের চাতুরী। বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে ইংরাজের সাথে তাঁর বিবাদ বাধল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার ছিল, কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে এই সুযোগ নিত। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিতে হ'ত। মীরকাশিম দেখলেন এতে দেশীয় বাণিজ্যের যেমন ক্ষতি, রাজস্বেরও তেমনি ক্ষতি। তিনি দেশীয় বণিকদের বাঁচাবার জন্য বাণিজ্য-শুল্ক রদ করে দিলেন। ইংরাজ বণিকরা আপত্তি জানাল। কিন্তু মীরকাশিম সঙ্কল্পে অটল। যুদ্ধ বাধল।

কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা আর বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলেন।

আবার নবাব হলেন মীরজাফর। এবার মীরজাফর একেবারে ইংরাজের হাতের পুতুল।

দেশে শুরু হ'ল শোষণ।

শোষণের প্রথম বলি বাংলার তাঁতি। তাদের অপরাধ—তাদের তৈরী বস্ত্র পৃথিবীর সেরা, তাদের হাতের তোলা রেশম ও মসলিন বিশ্বের দরবারে আদৃত।

কোম্পানীর দাদন নাও আর মুচলেখা লিখে দাও ঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক কাপড় তৈরী করে দেব, আর অন্য কোন বিদেশীর কাছে কাপড় বেচব না। কাপড়ের দাম সাহেবরা যা ধার্য করে দেবে, তাই নিতে হবে।

তাঁতিরা দেখল, এতো মস্ত বড় জুলুম। ফরাসী, ওলন্দাজ, আরমানিদের কুঠিতে কাপড় বেচলে বেশী দাম পাওয়া যায় কিন্তু তা বেচবার জো নাই। মীরজাফর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,—ইংরাজদের বাণিজ্য-কুঠির সাহেব ও গোমস্তা-পেয়াদার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। সুতরাং তাঁর কাছে সুবিচার পাবার আশা নাই।

বিপন্ন বাংলার তাঁতিকুল। অত্যাচার নিপীড়ণে তারা পাগল। অর্থগৃধ্নু, নীচ শয় কুঠির সাহেব, গোমস্তা, পেয়াদা এই পশুর দল সিপাই নিয়ে তাঁতিদের বাড়ি চড়াও হ'ত....লুট করত, পুরুষদের মারত, মেয়েদের অপমান করত।

রেশম আর মসলিন যারা বুনত সে সব তাঁতিদের উপরও হ'ত জুলুম। তাদের ধরে কোম্পানীর লোকরা নিজেদের কুঠিতে কাজে লাগাত। কাজের সময় কাছে বসে থাকত জমাদার। দোষ হ'লে মারত চাবুক। মাসে বেতন দেড় টাকা। পেয়াদা, জমাদার, গোমস্তা তা থেকে দশ পয়সা জোর করে আদায় করত। ভয়ে তাঁতিরা নিজেদের আঙুল কাটল। কাটা আঙুলে বোনা যায় না রেশম মসলিন। বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংস হল এইভাবে।

আবার কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ১৭৭৬ সালে এক রাত্রে কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে যায় সাতশ' তাঁতি। বাংলার মাটিতে এমনি করে সেদিন বাংলার গৌরব বস্ত্রশিল্প লোপ পেল।

একজন নামকরা তাঁতি সভারাম বসাক। সভারামের হাতের তৈরী একখানা কাপড়ের শিল্পনৈপুণ্য দেখে নবাব আলিবর্দি খুশি হয়ে তাকে পাঁচশ বিঘা লাখেরাজ জমি দান করেন।

সভারাম তৈরি করত কাপড়। হঠাৎ একদিন ইংরাজদের কুঠির গোমস্তা সিপাই নিয়ে হাজির হল তার বাড়িতে। তার জামাই আর ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল কুঠিতে। তাদের জোর করে দাদন দিল—আর একটা চুক্তিপত্রে তাদের সই করিয়ে নিল। চুক্তিপত্রে কি লেখা ছিল তা তাদের পড়িয়ে শোনান হ'ল না। দু'মাস পর আবার তাদের কুঠিতে হ'ল তলব।

সাহেব বলল, দু'মাসের মধ্যে দু' হাজার রেশমী কাপড় তৈরী করে দেবার চুক্তি করেছিলে, কাপড় এনেছ?

গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল সভরামের ছেলে আর জামাই।

তারা অনুনয় করে বলল—দু' মাসে কি দু' হাজার কাপড় তৈরী করা যায়?

কুঠির গোমস্তা বলল—ধর্মাবতার, ওরা বড় বদলোক। সব কাপড় সৈদাবাদে আরমানিদের কুঠিতে চালান করেছে।

সাহেব হুকুম করল, এদের কলকাতার জেলখানায় পাঠাও, আর বাড়ির মাল ক্রোক করে দাদনি টাকা আদায় কর।

গোমস্তা এই চায়। সে জানত সভারামের বাড়িতে অনেক টাকা আছে। মাল-ক্রোকের নাম করে সে টাকা লুট করা চলবে।

সিপাইরা সভারামের বাড়ির মাল ক্রোক করতে আসছে, এই খবর পেয়ে ইজ্জতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল বাড়ির মেয়েরা। পিছু পিছু ছুটল সিপাইরা। মেয়েরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ইজ্জত বাঁচাল।

সিপাইরা সভরামের বাড়ি ভেঙে মাটি খুঁড়ে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলল। সভারামের যথাসর্বস্ব লুট হ'ল। কারা লুট করল? ইংরাজ?....না! আমাদের দেশের লোক। গোমস্তা, পেয়াদা, সেপাই সবাই বাঙালী কিন্তু ইংরেজের পদলেহী।

কুষ্ঠরোগে মরল দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর।

নবাব হলেন মীরজাফরের ছেলে নজমউদ্দৌল্লা। ঠিক নবাব নয়, কোম্পানীর হাতের কাঠের পুতুল।

বাংলায় নবাবের প্রতিনিধি রেজা খাঁ আর বিহারে সিতাব রায়। দু'জনাই কোম্পানীর দালাল। সকলে হাত মিলাল ইংরাজ বণিকদের সাথে—বাংলার কৃষক ও কারিগরদের শোষণের জন্য।

লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর দুর্বল বাদশা শাহ আলমের কাছ থেকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর জন্য লাভ করলেন। এতদিন ইংরাজ বণিকরা বাংলার কারিগরদের শোষণ করছিল। এবার কারিগরদের সাথে চাষীদেরও শোষণের ব্যবস্থা হ'ল।

অপদার্থ বাদশা, অপদার্থ নবাব প্রজার মঙ্গল দেখলেন না....চিনলেন শুধু বিলাসিতার অর্থ।

লর্ড ক্লাইভের পরামর্শে কোম্পানি লবণ, তামাক ও সুপারির এক-চেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করল।

এই বাণিজ্য সম্বন্ধে তারা প্রবর্তন করল একটি কঠোর নিয়ম। যারা লবণ, তামাক, সুপারি উৎপাদন করে তারা দেশের লোকের কাছে তা বিক্রি করতে পারবে না। তাদের তা ইংরাজ বণিকসভার নিকট বিক্রয় করতে হবে। ইংরাজ বণিকসভা বেচবে দেশের লোকদের

কাছে। অর্থাৎ বাণিজ্যের নামে চাষী ও কারিগরদের অর্থ লুট করার ফন্দি।

আগে প্রত্যেক মণ লবণ পাঁচসিকা দরে দেশীয় লোকদের কাছে বিক্রয় করত। এখন ইংরাজদের নিকট তারা বার আনা মণ দরে বিক্রয় করতে বাধ্য হ'ল। বার আনায় লবণ কিনে ইংরাজ বণিকরা তা সাত টাকায় বিক্রয় করতে লাগল।

বাণিজ্যের নামে লুট আরম্ভ হ'ল।

তারপর দেশীয় লবণ-শিল্পী মঙ্গলীদের উপর শুরু হ'ল অকথ্য অত্যাচার।

নিপীড়নের ঘটনা বলছি।

মদন দত্ত ছিল বর্ধমানের একজন লবণের ব্যবসায়ী। লবণের দারোগা সন্দেহ করে তার বাড়ি তল্লাসী করল। তল্লাসীর ফলে তার বাড়িতে পাওয়া গেল তিন সের লবণ। আর যাবে কোথা? কোম্পানীর লবণ অফিসের সাহেব আর বাঙালী বাবুরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করল যে, মদন দত্ত গোপনে লবণের ব্যবসা করছে।

মদন দত্ত বলল—এ লবণ সংসার খরচের জন্য।

সাহেব বলল—মিথ্যা কথা। এত লবণ কি সংসারে লাগে? বাঙালী বাবুরা সাহেবের কথায় সায় দিল।

সাহেবের খানসামা আরও এককাঠি উপরে। সে বলল—এক এক হাটে এক পোয়া লবণ আনি। তাতে এক সপ্তাহ চলে।

অতএব মদন দত্তের অপরাধ প্রমাণিত হ'ল। কলিকাতার জেলে মদন দত্ত প্রেরিত হয়। কুঠির গোমস্তা, পেয়াদা, সিপাই মদনের বাড়ি লুট করল। বাড়ির মেয়েরা পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। যখন তারা গ্রামে ফিরল তখন গ্রামের লোক তাদের আশ্রয় দিল না। বলল—ফিরিঙ্গির স্পর্শে তাদের জাত গেছে।

বাংলার সমাজ তখন এমনই স্রোতহীন, অনড়, অধঃপতিত সমাজ, প্রতিরোধতো দূরের কথা প্রতিবাদ জানাবার সাহসও কারও ছিল না। যাদের তারা রক্ষা করতে পারল না—তাদেরই জাতিভ্রষ্ট করল।

বাঙালীর নুন-ভাত। নুন গেল। এবার ভাতের উপর হাত পড়ল। ইংরাজ বণিকেরা ধানের ব্যবসা ধরল। দেশের পণ্য ধানের উপর তারা স্থাপন করল তাদের একচেটিয়া অধিকার।

বাঙালীর বাড়াভাতে ছাই পড়ল।

১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ ভারত ত্যাগ করলেন। চাষী, কারিগর, গরীবদের মেরে বাংলাকে খোঁড়া করবার সব ব্যবস্থা তিনি সম্পূর্ণ করে গেলেন।

১৭৬৮ সন। বাংলাদেশে ধান কম জন্মাল!

প্রজাদের নিকট থেকে কড়ায়-গণ্ডায় খাজনা আদায় করল বাংলার দেওয়ান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বীজ-ধান পর্যন্ত বিক্রি করে প্রজারা খাজনা দিল। ইংরাজ-বণিকদের হাতে এসে পড়ল সব ধান। তারা সেই ধান মাদ্রাজ ও কলকাতায় জমা করল। বেশী দামে সেই ধান বিক্রি হতে লাগল। চলল ধানের কালোবাজার।

১৭৬৯ সন। বৃষ্টি হ'ল না। চাষীদের ঘরে নেই বীজ-ধান। চাষ হ'ল না কিন্তু খাজনার তাগিদ্ চলল ঠিক। ঘরে যা দু'মুঠো চাল ছিল তাও খাজনার জন্য বিক্রি হ'ল। ঘরে ঘরে চালের অভাব। বাজারে চাল পাওয়া যায় না। সব চাল রেজা খাঁ আর কোম্পানির ঘরে। কোম্পানী চাল জমিয়েছে কালোবাজারের জন্য আর তাদের সিপাই, পেয়াদা, গোমস্তা ও দালালদের জন্য। ওরা বাঁচলেই চলবে তাদের বাণিজ্য। দেশের লোক বাঁচল না মরল তাতে ইংরাজের কি?

দ্বৈত শাসন। নবাবের উপর শাসন-শৃঙ্খলার ভার……আর কোম্পানির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার।

নবাবের প্রতিনিধি রেজা খাঁ আর সিতাব রায় ইংরাজের দালাল। শাসন শৃঙ্খলা কোথায়?

ইংরাজ চায় অর্থ। প্রজা শোষণ করে চায় রাজস্ব আদায় করতে। প্রজার মঙ্গল দেখবার কেউ নাই। প্রজার জন্য কারও দায়িত্ব নাই।

দেশে অরাজকতা। এই অরাজকতা সৃষ্টি করলেন লর্ড ক্লাইভ। এই অরাজকতায় (১৭৫৭—৭০) বাংলার মেরুদন্ড ভেঙ্গে স্থাপিত হল বৃটিশ সাম্রাজ্য তৈরীর প্রথম সিঁড়ি।

পলাশীর যুদ্ধের পর এই অরাজকতা ক্লাইভ ইচ্ছা করেই কায়েম করলেন।

চারিদিকের গোলযোগে ইংরাজ সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। গোলযোগের মধ্যে সকলে আসছে ইংরাজের কাছে। সকলেই হয়ে পড়েছে ইংরাজের কেনা গোলাম।

দেশের প্রধানরা হ'ল কাবু। আর সেই অবসরে ইংরাজ করতে লাগল বাণিজ্যের নামে লুট। একহাতে তারা ভাঙতে লাগল এদেশের শিল্প আর শিল্পীদের সমাজ, আর অন্য হাতে গড়তে লাগল নিজেদের কলকারখানা।

সোনার দেশ বাংলাদেশ হতে লাগল গরীব। আর গরীব ইংল্যান্ড হ'ল সমৃদ্ধশালী।

আমাদের মঙ্গলীদের অন্ন মারা গেল, আর তাদের দেশে তৈরী হ'ল লিভারপুল—লবণের কারখানা। আমাদের দেশের তাঁতিরা হ'ল আঙুলকাটা, আর তাদের দেশে গড়ে উঠল ম্যাঞ্চেষ্টার—কাপড়ের কারখানা। আমাদের দেশের লোহার কামারদের যাঁতা বন্ধ হ'ল, আর তাদের দেশে তৈরী হ'ল বার্মিংহাম—লোহালক্কড়ের কারখানা।

ইংলন্ড গরীব দেশ থেকে হ'ল শিল্পপ্রধান দেশ। আর সুখী বাংলাদেশ রাতারাতি হয়ে পড়ল মড়কে, দুর্ভিক্ষে, নিরানন্দে ম্রিয়মাণ। বাংলার ভাঙা বুকের ওপর তৈরী হল বর্তমান ইংল্যান্ড।

ইংরাজ বণিকের এই সীমাহীন শোষণের চূড়ান্ত রূপ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলা সন ১১৭৬ সাল ইংরাজী বছরের ১৭৭০ সাল। বাংলার বুকে নামল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তর। সেই মন্বন্তরের নাম শুনলে বাংলার লোক আজও ভয়ে শিউরে ওঠে।

এক দু'বছর পর পর অজন্মা, তার উপর দেশের চাল ইংরাজ বণিক

আর রেজা খাঁর হাতে। কালোবাজারে চাল বিক্রি করে তারা মোটা টাকা আয় করে।

ভাতের অভাবে বাঙালী মরল। তাতে ইংরাজের কী? তাদের ত' টাকা হ'ল। এই ইংরাজ সেদিন বাংলার ভাগ্যবিধাতা—তারা মুখের অন্ন নিয়ে খেলে জুয়া, অন্নহীন লোকদের ঘর ভেঙে খাজনার পয়সা আদায় করে।

বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ লোক মরল—ভেঙে পড়ল বাংলার সমাজ। চাষীর হাল গেল, রাখালের গরু গেল, কামারের যাঁতা গেল, তাঁতির তাঁত গেল....বাঙালীর যা কিছু ছিল সব গেল।

ক্লাইভ পরিচালিত ইংরাজ বণিকদের একটানা সর্বাঙ্গীণ শোষণের ভয়াবহ পরিণাম—মন্বন্তরে বাংলা হ'ল মহাশ্মশান।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার মহাশ্মশানের বরেন্দ্রভূমিতে বিদ্রোহী সশস্ত্র সন্ন্যাসীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল "বন্দেমাতরম্"—যা বাঙালীর তথা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চিরন্তন আওয়াজ—"বন্দেমাতরম্"।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি (৫ই আগষ্ট ১৭৭৫)

• বণিকরাজ ইংরাজের সীমাহীন শোষণ ও দুঃশাসনের তীব্র প্রতিবাদ •

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে দেখা দিল অরাজকতা।

বাদশারা দূরদৃষ্টির অভাবে ইংরাজদের দুর্গ গড়বার এবং সৈন্য রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই ভুলের ফল দেখা দিল এখন। ইংরাজরা হ'ল দেশের সর্বেসর্বা।

বাংলার নবাবরা ইংরাজদের হাতে কাঠের পুতুল।

নন্দকুমার মীরজাফরের আমলে ১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৪- ৫ এবং তৎপুত্র নজমউদ্দৌলার আমলে ১৭৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত নবাবের দেওয়ান ছিলেন।

১৭৬৫ সালে ক্লাইভ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং বাংলার কারিগর ও চাষীদের শোষণ শুরু হয়।

নন্দকুমার দেখলেন, নবাবরা স্বাধীন না হ'লে এ নির্যাতনের শেষ হবে না।

নবাব তখন মীরজাফরের কিশোর পুত্র নজম। মহারাজ নন্দকুমার নবাবের পক্ষে বাদশার সাথে সন্ধি এবং ফরাসী ও মারাঠাদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে সচেষ্ট হলেন।

ক্লাইভ জানতেন মহারাজ নন্দকুমার কর্মদক্ষ লোক। ক্লাইভ নন্দকুমারের পরামর্শ ছাড়া চলতেন না। এখন তাঁর সন্দেহ হল নন্দকুমার ইংরাজের প্রভুত্ব নষ্ট করতে চান।

তিনি নন্দকুমারকে নজরবন্দী করলেন।

১৭৬৬ সন। নজমের মৃত্যু হ'ল। নবাব হলেন মীরজাফরের স্ত্রী মণি বেগমের বালক পুত্র সইফুদ্দৌলা।

মণি বেগম কোম্পানির উপর সদয় ছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁকে মা বলত।

রেজা খাঁ আর সিতাব রায়কে দিয়ে কোম্পানি রাজস্ব আদায় করাত। নবাব সরকারে মহারাজ নন্দকুমারের আর প্রতিপত্তি থাকল না। নবাব সরকারের মোড়লি করে ইংরাজ দালালরা।

নন্দকুমারের প্রতিপত্তি খর্ব হতেই দেশে ফিরলেন ক্লাইভ।

ক্লাইভের পর লাট হয়ে এলেন ভারলেস্ট···তারপর কার্টিয়ার। শোষণ আর অত্যাচার চলল অব্যাহত।

অত্যাচারিত মানুষ নন্দকুমারের কাছে আসে প্রতিকারের আশায়। তিনি নির্বাক। ইংরাজের সর্বনাশা রূপ তাঁর চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। ইংরাজের শুভেচ্ছার উপর তাঁর এতদিন ভরসা ছিল, তা আর রইল না। অথচ ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনে নন্দকুমারের অবদানও কম নয়!

ইংরাজরা ফরাসীদের আড্ডা চন্দননগর আক্রমণ করল।

হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের উপর সিরাজের আদেশ ছিল—ইংরাজের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য কিন্তু তিনি ফরাসীদের সাহায্য না করে নবাবের প্রেরিত সেনানায়ক দুর্লভরায়কে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন। এইভাবে অর্থলোভে নন্দকুমার বাংলার সর্বনাশের পথ খুলে দিলেন।

এখন নন্দকুমার দেখলেন, ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বের কি পরিণাম। মীরকাশিম দেখেছেন একদিন। এখন দেখলেন নন্দকুমার।

মীরকাশিম দেশত্যাগী, নন্দকুমার পদচ্যুত।

মণি বেগমের বালকপুত্র সইফের পর নবাবী পেল মীরজাফরের বব্বু বেগমের বার বছরের ছেলে মবারক। এর রাজত্বকালে এল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

মন্বন্তরে পীড়িত জনসাধারণ হ'ল নন্দকুমারের শরণাপন্ন।

দেশে চাল নেই। টাকায় কি হবে আর! চাল সব ইংরাজ বণিক আর রেজা খাঁর হাতে। কালোবাজারে চাল বিক্রি ক'রে মুনাফা করে ইংরাজ বণিক আর তাদের দালালরা।

নন্দকুমার চোখের উপর দেখলেন বিভীষিকা। প্রতিকার? দুই উপায়—অস্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ বিতাড়ন অথবা আবেদন-নিবেদন।

সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্র বাংলায় ছিল সেদিন। অধিকারচ্যুত জমিদার, জায়গীরহারা দেশী সিপাই, অন্নহারা কারিগর, শোষিত চাষী, দুর্ভিক্ষে সর্বহারা বাঙালী, এদের সংগঠিত করতে পারলে বাংলার মাটিতে ইংরাজ রাজত্বের কবর খনন করা যাবে। কিন্তু নেতৃত্ব দেবার লোক কোথায়?

নন্দকুমারের নেতৃত্ব দেবার যোগ্য সামরিক প্রতিভা ছিল না, খোলা ছিল আবেদন-নিবেদনের পথ।

বাংলার মর্মস্পর্শী বিবরণ বিলাতের সাহেবদের জানাবার জন্য নন্দকুমার লণ্ডনে নিজের একজন প্রতিনিধি পাঠালেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা বিলাতে সবিস্তারে প্রচারিত হ'ল। বিলাতে ছড়িয়ে পড়ল কোম্পানির কর্মচারীদের নির্মম শোষণের কথা। কলঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ক্লাইভ আত্মহত্যা করলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার গবর্ণর বদলি করলেন এবং গবর্ণর করে পাঠালেন ওয়ারেন হেষ্টিংসকে—একজন পাকা ঘুষখোর আর ওস্তাদ শোষককে।

দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী যারা, তাদের বিচারের ভার পড়ল হেষ্টিংসের উপর। কাঠগড়ায় উঠল মাত্র দু'জন লোক। দু'জনই এদেশের লোক—রেজা খাঁ আর সিতাব রায়। নির্মম শোষণে পটু ইংরাজ সওদাগররা কই?

তারা সাধু। কাঠগড়ায় রেজা খাঁ আর সিতাব রায়।

বিচারক হেষ্টিংস।

চোরের বিচারক চোর। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

মামলা নিয়ে হেষ্টিংস দেরী করতে লাগলেন।

প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলেন মহারাজ নন্দকুমারের উপর। নন্দকুমার তাড়াতাড়ি যোগাড় করলেন মামলার খুঁটিনাটি।

মহরাজ নন্দকুমার আন্দোলনের নায়ক। তাকে শান্ত করবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের ভার দেওয়া হ'ল তাঁর উপর। উপরন্তু নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস নবাবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন।

....আসামী রেজা খাঁ আর সিতাব রায়। চৌদ্দ মাস পরে প্রমাণাভাবে আসামীরা মুক্ত হ'ল কিন্তু তাদের চাকরি গেল।

তা যাক্। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কৃপায় তাদের চৌদ্দপুরুষের উদরান্নের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই সুযোগে হেষ্টিংস সুবাদারের পদ তুলে দিয়ে নিজের হাতে নিলেন রাজস্ব আদায়ের ভার এবং কোম্পানির মা মণি বেগমকে করলেন বব্বু বেগমের কিশোর পুত্র নবাব মবারকের অভিভাবিকা।

মহারাজ নন্দকুমারের আন্দোলনের ফলে কোম্পানী আর কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করতে পার্লামেণ্টের প্রধানমন্ত্রী নর্থ 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামে তৈরি করলেন এক আইন।

এই আইনে হেষ্টিংস হলেন বাংলার লাট এবং ভারতের বড়লাট। নর্থের আইনে বড়লাটের পদ নূতন সৃষ্ট হ'ল। এই বড়লাটের কাউন্সিলে চারজন সদস্য নিযুক্ত হলেন।

কোম্পানি আর কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে দেশীয় লোকদের বিবাদ মিটাবার জন্য তৈরী হ'ল সুপ্রিমকোর্ট। ইলাইজা ইম্পে প্রধান জজ। আরও তিনজন পিউনি জজ।

নন্দকুমারের আন্দোলনে চারিদিকে কোম্পানীর বদনাম রটে। তা দূর করবার জন্য নর্থের এই আইন। উপর থেকে দেখতে ভালো, ভিতরে সব ফাঁপা। সুপ্রিমকোর্ট, কাউন্সিল কিছুই নয়—সবই হেষ্টিংস।

উপরে সভ্য শাসনের ব্যবস্থা, ভিতরে কিন্তু দুর্নীতি আর দুঃশাসনের মহিমা। কোর্ট আর কাউন্সিল দুর্নীতিপরায়ণের আড্ডা—আর হেষ্টিংস তার সর্বেসর্বা।....

কোনও একটা জাতির সকলে খারাপ হয় না। ইংরাজদের মধ্যেও ছিল ভাল লোক। সুপ্রিমকোর্টের একজন জজ আর কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন সৎলোক। নন্দকুমার হেষ্টিংসের কুকার্য বিবৃত করে কাউন্সিলের সৎ সদস্য ফ্রান্সিসকে পত্র দিলেন।

হেষ্টিংস ক্রুদ্ধ হলেন মহারাজ নন্দকুমারের উপর। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ দায়ের হ'ল সুপ্রিমকোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের নামে। এ মামলা টিকল না।

প্রতিহিংসাপরায়ণ হেষ্টিংস নন্দকুমারকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেন। বন্দী অবস্থায় নন্দকুমার কারাগারে নীত হলেন।

নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, পরদুঃখকাতর নন্দকুমার অপরাধী? এইসব শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। সবকিছু সাজিয়ে মিথ্যা মামলা তৈরি হ'ল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে।

নন্দকুমারের নামে দলিল জাল করার মামলা উঠল।

মামলা দায়ের করল হেষ্টিংসের পরামর্শে মোহনপ্রসাদ—মৃত বুলাকি দাসের অছি গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গুলালের এটর্নি।

এক সময় নন্দকুমার বুলাকি দাসের দোকানে কিছু অলঙ্কার জমা রাখেন কিন্তু তা পরে খোয়া যায়। বুলাকি তার মূল্য বাবদ নন্দকুমারকে লিখে দেন ৪৮০২১ টাকায় তমসুক। বুলাকির মৃত্যুর পর তার নির্দেশ মত কোম্পানীর খত বিক্রি করে তমসুকের টাকা নন্দকুমার উশুল করেন এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দুর্গতদের অন্নসংগ্রহের জন্য ব্যয় করেন। তমসুকের সাক্ষী হিসাবে আবদ কামালউদ্দিন নামক এক ব্যক্তির ছিল মোহরের ছাপ এবং নাম ছিল আবদ কামালউদ্দিন। মোহনপ্রসাদ কামালউদ্দিন খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করে বলল—তমসুক্ জাল।

তমসুকে সাক্ষী ছিল আবদ কামালউদ্দিন কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে যে সাক্ষ্য দিল তার নাম কামালউদ্দিন খাঁ।

এ আসল লোক নয়। সাজানো লোক। তবুও এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'ল।

সে বলল—মহারাজ নন্দকুমার যখন মীরজাফরের দেওয়ান তখন আমি কোন কার্যবশতঃ তমসুকে মোহর ছাপ দিয়ে নবাব সরকারে পাঠাই। মহারাজ নন্দকুমার তা ফেরত দেন না। কোম্পানির টাকা মারবার জন্য তিনি তমসুকের সেই মোহর ব্যবহার করেছেন।

এই মিথ্যা সাক্ষ্যের সূত্রে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হলেন। জজরা হেষ্টিংসের হাতের লোক—প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পে ত' বটেই। জালিয়াতির অপরাধে নন্দকুমারের হ'ল ফাঁসির হুকুম।

পার্লামেণ্টে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি স্থগিত রাখবার প্রস্তাব পাস হ'ল কিন্তু তার আগেই শয়তান হেষ্টিংসের গোপন ব্যবস্থায় নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হ'ল।

আঁতকে উঠল সারা কলকাতা। কলকাতার কোন বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলল না।

ইংরাজের কুটনীতির বীভৎসতা বুঝতে পারল বাঙালী সমাজ।

নন্দকুমার পেল বেইমানির যথাযথ শাস্তি।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭১-১৭৭৫)

ফাঁসির কাঠে ঝুললেন প্রথম বাঙালী—মহারাজ নন্দকুমার।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মহারাজ নন্দকুমার যখন কোম্পানির শোষণ ও দুর্নীতি বন্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন তখন সারা উত্তরবঙ্গে জেগে উঠেছিল এক সশস্ত্র বিপ্লবের ঢেউ।

ইহাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭১—৭৫)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মধ্যে এই সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হয়।

হেষ্টিংস সাহেব ও তার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আজ্ঞাবহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। সময়মত খাজনা না দিতে পারলে দেবী সিংহের হাতে কারও নিস্তার ছিল না।

কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকগণের নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন দেবী চৌধুরাণী নাম্নী একজন বীর নারী। তাঁর গুরু ছিলেন ভবানী পাঠক। শোষকের অর্থ লুণ্ঠন করে সেই ধন দরিদ্রকে বিতরণ করা ও অনাথ দুর্বলকে রক্ষা করাই ছিল তাঁদের কাম্য।

লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান সাহেব দেবী চৌধুরাণীকে ধরবার জন্য সচেষ্ট হন কিন্তু তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়।

উত্তরবঙ্গের এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহের (১৭৬৫) উর্বর ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়। অধিকার-চ্যুত জমিদার, জায়গিরহারা দেশী সিপাই, অন্নহারা কারিগর, শোষিত চাষী, দুর্ভিক্ষে সর্বহারা বাঙালীরা সেদিন উত্তর বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পতাকা তলে এসে জুটল। বিদ্রোহীরা সাধারণ মানুষ। এরা থাকত সন্ন্যাসীর বেশে ......সন্ন্যাসীর মত তাঁদের কঠোর ব্রত পালন করতে হত। তাই এই বিদ্রোহকে বলা হয় সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। উপাস্য দেবী তাঁদের জননী জন্মভূমি।

রাজসরকার থেকে কলকাতায় যত খাজনা ও ধান যেত সন্ন্যাসীরা তা পথিমধ্যে লুটে নিত। মন্বন্তরে দুর্গত মানুষদের মধ্যে তারা তা বিতরণ করত। অর্থসংগ্রহ, অস্ত্র তৈরী, আর সন্তানদের পোষণের জন্য তারা ডাকাতি করত—তাদের লক্ষ্য ছিল নবাব আর কোম্পানির শাসন শেষ করে মাতৃভূমির মুক্তি সাধন। সন্তান-সৈন্যদের হাতে থাকত লাঠি, সড়কি বা দু'চারটে বন্দুক। তারা শিবাজির মত গেরিলা যুদ্ধ করত। কোম্পানির সিপাইরা যেদিকে থাকত না তারা সেইদিকে অভিযান করে লুঠ করে নিত কোম্পানির রসদ কিন্তু যেই সিপাইদের আসবার খবর পেত অমনি নিরাপদ স্থানে তারা পালিয়ে যেত। কোম্পানির লোকরা তাদের কোন পাত্তা পেত না।

জনসাধারণ সন্তানদের এত ভালবাসত যে তাদের কোন খবর কোম্পানির লোকদের কাছে প্রকাশ করত না।

কোম্পানির সিপাইদের সাথে সন্তানদের কয়েকবার সম্মুখ সংঘর্ষ বাধে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোম্পানির সিপাইরা পরাজিত হত। কোম্পানির সিপাইদের কামান, বন্দুক থাকলে কি হবে? সংখ্যায় ছিল সন্তানদের থেকে তারা কম।

হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামে একজন সুদক্ষ সেনানায়কের অধীনে একদল সৈন্য বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। সন্তানদের সহিত সংঘর্ষে ইংরাজের অনেক সৈন্যের মৃত্যু হয়। স্বয়ং টমাস ও আর একজন সেনানায়ক সন্তানদের হাতে প্রাণ দিল। এর পর কাপ্তেন এডওয়ার্ড নামে আর একজন সেনানায়ক এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। তার সৈন্যদল সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় এবং নিজেও প্রাণ হারায়। উত্তরবঙ্গের মাঠ, ঘাট, প্রান্তর সেদিন সন্তান সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন অমর উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। 'আনন্দমঠ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কাহিনী।

ইংরাজরা ধীরে ধীরে রাজশক্তি হাতে পায়। আসে নূতন নূতন সৈন্য, বৈজ্ঞানিক রণসম্ভার, কামানের পর কামান। সন্তান আর কৃষকদের লাঠি, সড়কি বৈজ্ঞানিক রণসম্ভারের কাছে হয় ভোঁতা। থেমে যায় বিপ্লবের গান! নিস্তব্ধ সন্তানদল। নীরব বরেন্দ্রভূমি।

সেদিন বরেন্দ্রভূমিতে সেই সন্তানদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তাদের যুদ্ধের গান 'বন্দেমাতরম্'। তা' আজ সারা ভারতে হচ্ছে ধ্বনিত—শিকল ভাঙার সার্থক গান—বন্দেমাতরম্।

বাংলার আকাশে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মেঘ

ইংরাজের অগ্রগতির প্রধান বাধা ছিল দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা। এখন তারাই হল ইংরাজের মিত্র। দ্বিতীয় বাধা দেশের কারিগর। তারা হ'ল সর্বহারা। তৃতীয় দেশের মাটির সাথে সম্বন্ধ ছিল—জমিদার ও কৃষক। কোম্পানি যেদিন রাজস্ব আদায়ের ভার নিজেদের হাতে নিল সেদিন এদের উপর আঘাত পড়ল। আঘাতের প্রত্যুত্তর দিল এরা। এদের হাতেই উঠল বিদ্রোহের ধ্বজা।

নবাব মীরকাশিম নবাবীর বখশিস্ স্বরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন (১৭৬০)। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বীরভূম রাজের সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় ঘটে।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ধলভূমের রাজা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন।

॥ প্রজাবিদ্রোহ ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ ॥

তখনকার দিনে জমিদাররা ছিলেন প্রায় স্বাধীন রাজার মত। তাঁদের থাকত দুর্গ, সৈন্য। জমিদারদের এই সামরিক শক্তি রাখতে দিল না কোম্পানি। এই সামরিক শক্তি নষ্ট করতে তারা শুরু করল।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের অধিকারে আসে মেদিনীপুর! মেদিনী-পুরের জঙ্গলমহলে জমিদারদের দুর্গ ছিল। জঙ্গলমহলের অধিবাসী বন্য-কৃষক প্রজা চুয়াড়রা ঐ সব জমিদারদের অধীনে পাইক ও সৈনিকের কার্য করত এবং পুরস্কার স্বরূপ তারা জমিদারদের কাছ থেকে জমি জায়গির পেত। কোম্পানি জায়গির জমি বাজেয়াপ্ত করল এবং জঙ্গল-মহলের দুর্গ ভেঙে ফেলবার হুকুম দিল। ফলে চুয়াড়রা বিদ্রোহী হয়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০০ মাইল ব্যপী জঙ্গলমহলে চুয়াড়দের বিদ্রোহ ঘোষিত হল। লেফটেন্যাণ্ট ফারগুসানকে এই বিদ্রোহ দমন করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়।

চুয়াড়গণের বিষাক্ত শরে ও ব্যাধিতে অনেক ইংরাজ সৈন্যের প্রাণহানি হয়। এই বিদ্রোহ পুরাপুরি দমন করা যায়নি তখন। ১৭৯৮ সালে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়কে কেন্দ্র করে তারা নানাস্হানে আক্রমণ চালায়। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য কোম্পানী কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করেন। চুয়াড়দের সমস্ত আড্ডা ভেঙে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এমনি করে বংলার আকাশে উড়তে লাগল খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মেঘ। মেঘ উড়ে যায় আবার জমা হয়। এভাবে চলতে চলতে এল ঝড়—সারা ভারতব্যাপী মুক্তির আন্দোলন—সিপাহী-বিদ্রোহ।

সংস্কার ও প্রগতির আবেদন।

বাঙালীর খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ শূন্যে বিলীন হল। নিবিড় ঐক্য আর পাকা সংগঠনের অভাবে সেসব ব্যর্থ হ'ল। বাঙালীর পরাজয় ও ব্যর্থতা ডেকে আনল সারা ভারতের দুর্দিন শোষিত বাংলার অর্থ আর সম্পদে ইংরাজের দিগ্বিজয় সুরু হয়। বাংলার মাটি থেকে ইংরাজের আঘাত চলল ভারতের এক একটি প্রদেশের দিকে। ভারত জয়ের ঘাঁটি হল বাংলা। হেষ্টিংস সুরু করলেন ভারত-জয়ের আয়োজন।

মারাঠা আর মহীশূর তখন ভারতের উদীয়মান দুটি শক্তি। তাদের হাতে পরাজয় হল হেষ্টিংসের। পরাজয়কে জয়ের গৌরবে মণ্ডিত করলেন ওয়েলেসলি (১৭৯৮)।

ভারতের প্রবল শক্তি তখন মারাঠা। তাদের হাতে সেদিন দিল্লীর সিংহাসন। প্রবল মারাঠাদের ভয়ে তখন দেশীয় রাজারা সন্ত্রস্ত। কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে তারাও মাথা পেতে নিল ওয়েলেসলির অধীনতামূলক সন্ধি। স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত সূর্য মহীশূরের টিপু সুলতান। ওয়েলেসলির অধীনতামূলক সন্ধির আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিলেন না। ইংরাজ সৈন্য তাঁর রাজ্য আক্রমণ করল। প্রতিবেশী নিজাম ইংরাজের সামন্ত। টিপুর সাহায্যে অগ্রসর হলেন না নিজাম। মারাঠাদের মধ্যে তখন দলাদলি, সিংহাসন নিয়ে হানাহানি।

একা লড়লেন টিপু। শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের সামনে তরবারি হাতে ইংরাজের কামানের সাথে লড়তে লড়তে তিনি প্রাণ দিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু।

অর্ধেক ভারতের উপর উড্ডীন গৈরিক পতাকা কম্পমান। চারিদিকে জেগে উঠেছে ইউনিয়ন জ্যাকের বিভীষিকা।

শিবাজীর মন্ত্র শূন্যে বিলীন হল। মারাঠার বিপুল শক্তি নিঃশেষ। মারাঠাদের বিরাট সাম্রাজ্য গৃহবিবাদে হ'ল খণ্ড খন্ড। মারাঠার পতনের সাথে ভারতের স্বাধীনতার সকল সম্ভাবনা হল অস্তমিত। ছলে, বলে, কৌশলে ইংরাজ ধীরে ধীরে কুক্ষিগত করতে লাগল এক একটা করে দেশীয় রাজ্য—রাজপুতানা, আসাম, আরাকান, সিন্ধু, পাঞ্জাব।

ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের খোরাক যোগাত শোষিত বাংলা।

চারিদিকে আর্তনাদ, লাঞ্ছনা, অমানুষদের কোলাহল। ভারতবাসী আশাহীন, ভরসাহীন, আত্মহারা।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মহারাজ নন্দকুমার দুর্নীতি দমন ও অন্যায় অবিচারের অবসানের আবেদন তুলে শোষিত মানুষদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ইংরাজের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিনে ঐক্য ও সংগঠনের অভাবে পরাজিত বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আর একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের কণ্ঠে উঠল সংস্কার ও প্রগতির বাণী। তিনি রাজা রামমোহন।

১৮১৪ সাল। নূতন ধর্ম ও কর্মের বাণী নিয়ে কলকাতায় এলেন রামমোহন। শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হবে এই হল তাঁর পণ। ইউরোপে তখন শিল্পবিপ্লব। সেখানে গড়ে উঠল তিনটি শ্রেণী—ধনী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। তাদের মধ্যে লড়াই। সাগর পারের এই সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্পৃহা বিশ্বে আনল এক নূতন অনুপ্রেরণা। এই অনুপ্রেরণা যাতে আমাদের দেশে আসে এই হল রামমোহনের কামনা।

ইউরোপের এই জাগরণের বাহন হল ইংরাজী ভাষা। তিনি ছিলেন তাই ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী। তাঁর চেষ্টায় স্থাপিত হল ইংরাজী স্কুল আর কলেজ।

রাজা রামমোহনের প্রগতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ হল বাংলা সংবাদপত্র—চারিদিক থেকে সুরু হল নব চেতনার উদ্বোধন।

…মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়া হত সেদিন আমাদের এই অভাগা দেশে। জ্যান্ত মানুষকে বলি দেওয়া হত দেবতার সামনে। মৃত স্বামীর চিতায় জোর করে মেয়েদের পোড়ান হত। আরও কত কি কুসংস্কার!

রামমোহনের চেষ্টায় উঠে গেল ধর্মের নামে নরহত্যা।

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মমত অবক্ষয়িত ও বিকৃত হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী সংস্করণ—সাম্য, জাতীয়তা ও মুক্তির পথ।

নূতন ধর্মমত আনল কুসংস্কারের উপর আঘাত। বসল মেয়ে-পুরুষের কলেজ।

রামমোহনের প্রস্তাবে রাজপুরুষরা ও শিক্ষিত ইংরাজরা সুশাসন প্রবর্তনে পক্ষপাতী হল। শুরু হল ইংরাজের সুশৃঙ্খলার শাসন। ধীরে ধীরে স্থাপিত হল শহর, আদালত, হাসপাতাল, রাস্তা, রেল, ডাক ও তার। ভারত লাভ করল সংহত শাসন। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মমত প্রচারের ভিতর দিয়ে এল সর্বভারতীয় আন্দোলনের জোয়ার।

রামমোহনের সৃষ্ট নূতন ধর্মমত, নূতন সংস্কার, নূতন শিক্ষা—সাম্য, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র।

॥ নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬) ॥

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নায়েক নামক এক জনজাতি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে বিদ্রোহী হয়। বগড়ির রাজসরকারে এরা সৈনিকের কাজ করত। রাজার প্রদত্ত জায়গির জমি এরা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করত। কিন্তু কোম্পানি বগড়ির রাজা ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত করে এবং নায়েকদের জমি বাজেয়াপ্ত করে। ফলে নায়েকরা বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহীদের নেতার নাম অচল সিংহ।

নায়েকদের সহিত বহুদিন ধরে বৃটিশ সৈন্যের খণ্ড যুদ্ধ হয়। বৃটিশ সৈন্যেরা প্রথমে ব্যর্থ হয়। পরে বহু কামান একত্রে দেগে তাদের কেল্লা ধ্বংস করা হয়। অচল সিং একদল নায়েক সৈন্য নিয়ে বর্গীদের দলে যোগদান করে এবং বৃটিশ-অধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করে। কোম্পানির সৈন্যরা প্রতিরোধ করতে পারে না। বগড়ির রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্র সিংহ-ই অবশেষে ধরিয়ে দিল অচল সিংকে।

নায়েকগণ ছোট ছোট দলপতির অধীনে আরও কিছুদিন ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৮১৬ সালে তারা একেবারে পরাজিত হয়। প্রায় দু'শ নায়েক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। সতেরজন দলপতির প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি হয়।

আমরা আজ কত শহীদকে স্মরণ করি কিন্তু ভুলে গেছি এদের কথা। সেদিনকার সেই বিদ্রোহী জন জাতি—চুয়াড়, নায়েক, ডোম, বাগ্‌দি, দুলে, হাঁড়ি—আজ সমাজে অস্পৃশ্য। গ্রামের বাইরে পর্ণ-কুটিরে অবহেলিতভাবে তারা বাস করে। তারা ভূমিহারা, অন্নহারা, অন্যের ক্ষেত্রদাস। চিরকাল তাদের অবস্থা এ রকম ছিল না।

এদের পূর্বপুরুষ ইংরাজের সাথে লড়েছে, তারা ইংরাজের ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দিয়েছে। আমরা যেন তাদের ভুলেই গেছি।

॥ ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১) ॥

আরবের মরুপ্রান্তরে এই আন্দোলনের জন্ম। ভারতের মাটিতে এই আন্দোলন নিয়ে আসেন রায়-বেরিলির মওলবী সৈয়দ আহমদ। ওয়াহাবি আন্দোলনের মর্মকথা হল বিকৃত ইসলাম ধর্মের সংস্কার। বিকৃত হিন্দুধর্ম সংস্কারের জন্য রাজা রামমোহনের পশ্চাতে যেমন

একদল নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী যুবক কর্মক্ষেত্রে নেমেছিল—তেমনি বিকৃত ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য রায় বেরিলির সৈয়দ আহমদের পশ্চাতে নেমেছিল একদল নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী মুসলমান।

ওয়াহাবি দলের কর্মপন্থা ছিল ইংরাজ উৎখাতের আন্দোলন।

বাংলায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আসেন সৈয়দ আহমদ। বাংলায় তাঁর প্রধান শিষ্য হলেন তিতুমীর। তিতুমীর চব্বিশ পরগণার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা, লাঠিয়াল। এই পেশার জন্য তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। শেষে ওয়াহাবি আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন মূলত ধর্মভিত্তিক এবং ইংরেজদের আশ্রয়পুষ্ট জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

কলিকাতা আর চব্বিশ পরগণায় ছিল তিতুর কর্মকেন্দ্র। তিতুমীরের সঙ্ঘশক্তিতে ইংরেজরা ভয় পেল। ইংরাজ ও তিতুমীরের সংঘর্ষ আসন্ন হয়।

ইংরাজদের মিত্র শিখদের সহিত সংঘর্ষে মারা যান সৈয়দ আহমদ।

ইংরাজী ১৮৩১ সাল সেদিন। সেই সময় সুদক্ষ একদল ইংরাজ সৈন্য তিতুমীরকে আক্রমণ করল। তিতুমীরও তাঁর গুপ্তকেন্দ্র থেকে ইংরাজ সৈন্যদের বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়—১৪ই নভেম্বর আর ১৭ নভেম্বর দুদিন। ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে।

এবার তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হল বিরাট একদল সৈন্য। পরাজিত হয়ে তিতুমীর তাঁর জন্মভূমি গোবরডাঙার নিকটবর্তী নারকেলবেড়িয়া গ্রামে 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করেন। এই আশ্রয় থেকে প্রবলভাবে ইংরাজ সৈন্যদের বাধা দিলেন। তিতুমীরের সৈন্যদের হাতে লাঠি, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম আর ইংরাজ সৈন্যদের হাতে কামান, বন্দুক, রাইফেল। তবুও প্রথমে তিতুমীরের জয় হয়। পিছু হটে যায় ইংরাজ সৈন্য। আবার শক্তি সঞ্চয় করে আক্রমণ করে। এবার ইংরাজের জয় হল। তিতুমীর হলেন নিহত। বাংলার এক বিদ্রোহী শহীদ হলেন ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে।

॥ সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) ॥

সাঁওতাল পরগণার পাশ দিয়ে চলল রেল। দুর্ভেদ্য সাঁওতাল পরগণার পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর লুব্ধ বণিকরাজ ইংরাজদের দালাল দেশী জমিদার, মহাজন বেনিয়ার শোষণ আরম্ভ হল।

পাহাড়ের ছায়ায় শাল আর মহুয়ার বনানী ঘেরা শস্য-শ্যামল প্রকৃতির কোলে সাঁওতালরা মানুষ। স্বভাবতঃ তাই তারা সরল ও স্বাধীনচেতা। তাদের সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার মাঝখানে অমা-রাত্রির অন্ধকারের বিভীষিকার মত হাজির হল ইংরাজ শাসন—শাসনের নামে শোষণ।....বন্য সাঁওতালরা হল সংগ্রামী।

সাঁওতাল পরগণার রাজধানী বারহাইট-এর উপকণ্ঠে ভাগনাদিহি গ্রাম। সাঁওতালদের নেতা সীদু ও কানু দুই ভাই এই গ্রামে বাস করত। সীদু ও কানুর বিশ্বস্ত ছিল চাঁদ ও ভৈরব নামক অপর দুই ভ্রাতা। সীদুর প্রাণে বাজল সরকারের অন্যায় নিপীড়ন। সীদু ও কানু দুই ভাই বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয়কে নিয়ে সাঁওতালদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগল। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে তারা সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়কে সজাগ করে তুলল। ইংরাজদের কুঠি ও রেল লাইনের উপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হ'ল তাদের পরিকল্পনা।

সাঁওতালদের অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক, কুঠার, তলোয়ার আর সামান্য কয়েকটা বন্দুক। সীদু, কানু ও চাঁদ, ভৈরবের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সাঁওতালরা হল সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র। গ্রামে গ্রামে সাঁওতালদের কাছে গেল নেতা সীদুর আসন্ন বিদ্রোহের বার্তা ঃ

"তোমাদের কাছে এই এক টুকরো কাগজ যাচ্ছে ঃ ভগবান আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন, আর এরকম বহুৎ কাগজ পাঠিয়েছেন। মনে রেখো, ভাই—এ কাগজ ভগবানের আশীর্বাদ। ভয় নেই! নির্ভয় হও। আমাদের পিছনে আছেন ভগবান। ফিরিঙ্গি আমরা তাড়াবই। শাল গাছের ডাল গেলেই ঘর পিছু একজন করে আমার বাড়ীতে হাজির হবে। ভুলো না।"

১৮৫৫ সনের ৩০ শে জুন সীদুর বাড়ীতে বসল সভা। পূর্বাহ্নে সাঁওতালদের ঘরে ঘরে গেল শালগাছের ডাল। সীদুর বাড়িতে এল দলে দলে সাঁওতাল। নিল তারা মরণপণ সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প।

৭ই জুলাই থানার দারোগা একদল পুলিশ নিয়ে এল ভাগনাদিহি গ্রামে—সেদিনকার জমায়েত সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার জন্য।

সাওতালদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধল। সীদুর হাতে দারোগা নিহত হ'ল। ন'জন পুলিশ সাঁওতালদের হাতে প্রাণ দিল। অন্যান্য পুলিশ পালিয়ে গেল। বিদ্রোহ সুরু হল।

রাণীগঞ্জে মোতায়েন হল সরকারী সৈন্য। ১৬ই জুলাই সরকারী সৈন্যদের সাথে সাঁওতালদের প্রবল সংঘর্ষে সাঁওতালরা জয়ী হল।

একদিকে বন্দুক, রাইফেল, গুলিগোলা, বারুদ। অপর দিকে তীর ধনুক, কুঠার, তলোয়ার। পৃথিবীর অন্যতম পরাক্রান্ত সামরিক শক্তি একদিকে, আর অপর দিকে চির অবহেলিত নিঃস্ব ভারতের আদিম অধিবাসী জাতি। সাঁওতালদের দুর্দিন এল। ডাক, তার, রেলের জন্য সরকারী সৈন্যদের মধ্যে বেশ যোগাযোগ ছিল। আর যোগাযোগের অভাবে সাঁওতালরা হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন। এবার সুরু হয় পরাজয়ের পালা।

সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল হল আইন বহির্ভুত অঞ্চল।

এর বেশীর ভাগ জায়গা ছিল আগে বাংলার অন্তর্গত। এরপর সেটা বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাঙালী ও সাঁওতালদের বসবাসই এখানে বেশী। গোটা পশ্চিমবাংলায় অনেক সাঁওতালদের বাস। অধিকাংশ সাঁওতাল বাংলা ভাষাভাষী। ফলে সাঁওতালদের আমরা স্বচ্ছন্দে বাংলার লোক বলতে পারি।

সামরিক আইনের কবলে পড়ল সাঁওতাল জাতি। বিনা আইনে বে-আইনীভাবে সাঁওতালদের উপর সুরু হল দমননীতি। একদিকে নির্মম অত্যাচার, অপর দিকে অর্থের প্রলোভন।

নিপীড়নে দিশেহারা বহু সাঁওতাল আত্মসমর্পণ করল। বিশ্বাস-ঘাতকের চক্রান্তে ভাগলপুরের সরকারী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ল সীদু।

বৃটিশের কারাগারে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সীদু বন্দী হল। আরও দশ হাজার অনুচর কারা-প্রাচীরে ফাঁসির দিন গুনতে লাগল।

বাইরে তখনও স্থানে স্থানে চলছিল খণ্ডযুদ্ধ।

১৮৫৬ সালে শীতের শেষাশেষি বিদ্রোহের উল্কা থেমে যায় সর্বত্র।

শাল-অর্জুনের ডালে দশহাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল আর তাদের নেতা সীদুর ফাঁসি দিল ইংরাজ।

আসে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। বাংলার আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

রাজা-বাদশাদের গেল রাজ্য।—গেল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর, হায়দরাবাদ, মারাঠা রাজ্য এবং আসাম, আরাকান, রাজপুতানা, সিন্ধু আর শিখের রাজ্য।

ঐ সব জমি ইংরাজরা বিলি করল তাঁবেদারদের মধ্যে। এরাই আমাদের শোষণ করেছে, আমাদের মানুষ হতে দেয়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারী প্রথা উঠল কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকায় পুরানো জমিদার হল শিল্পের মালিক, ব্যবসার মালিক—আরও অনেক কিছু। একেই বলে পাপীর স্বর্গ—যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করল, দেশবাসীর যারা সর্বনাশ করল তাদের যুগের পর যুগ সুখভোগের ব্যবস্থা হল, আর যারা দেশকে ভালবাসল তাদের জন্য রইল অনাহার।

সেদিন অধিকারচ্যুত রাজারাজড়াদের আক্রোশ আর নির্যাতিত প্রজাদের আর্তনাদ এক হল। এর সঙ্গে মিশল দেশীয় সিপাইদের অসন্তোষ। দেশীয় সিপাইদের জন্য ইংরাজের এত বড় রাজ্য, অথচ ইংরাজদের অধীনে তাদের অবস্থা হল রীতিমত খারাপ।

একই কাজের জন্য দেশীয় সিপাইদের বেতন কম কিন্তু গোরা সৈন্য-দের বেতন বেশী। বড় বড় পদ গোরা সৈন্যের। দেশীয় সিপাইদের কৃতিত্ব যতই হোক না কেন, তাদের চলতে হত গোরা সিপাইদের হুকুম মত? দেশী সিপাইদের মান গেল।

সিপাইরা বেশীর ভাগ অযোধ্যা প্রদেশের লোক। বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরাজ অযোধ্যা দখল করল এবং সিপাইরাও ইংরাজদের উপর বিশ্বাস হারাল। দেশীয় রাজাদের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিল ইংরেজ সরকার, সৈন্যরা হারাল তাদের রুজিরোজগার। অসন্তোষ দানা বাঁধল।

দেশীয় সিপাইদের মধ্যে সুরু হল খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার। এর পর গরু

ও শূকরের চর্বি দেওয়া এনফিল্ড কার্তুজ দাঁতে করে কাটাবার হুকুম হল। সিপাইরা মনে করল হয়ত তাদের জাত-ধর্ম দুই-ই গেল।

রাজারাজড়ারা অধিকারচ্যুত—জনসাধারণ নির্যাতিত, অসন্তুষ্ট সিপাই। সকলের মন বিদ্রোহের দিকে। ভারতের বুক থেকে ইংরাজদের তাড়াবার জন্য সকলে দৃঢ়সংকল্প।

চলে বিদ্রোহের আয়োজন ও প্রস্তুতি। একই দিনে সুরু হবে সর্বত্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহের কাজ—ইংরাজ হত্যা, ইংরাজের ঘাঁটি দুর্গ দখল আর ইংরাজের সকল শক্তি নিঃশেষে ধ্বংস।

বিদ্রোহের আয়োজন ও পরিচালনা করলেন মারাঠা রাজকুমার নানা-সাহেব, ফৈজাবাদের মৌলবী অহম্মদ শা, মারাঠা-বীর তাঁতিয়া তোপে, রাজপুত বীর কুমার সিংহ, অসম সাহসিকা ঝাঁসির রাণী। এঁদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হল দেশীয় সিপাই আর জনসাধারণ।

বিদ্রোহের প্রথম অবলম্বন হল সিপাইরা। আর তাদের সহায়ক হল দেশের জনসাধারণ। এই সিপাইরা প্রথম সুরু করল এই বিদ্রোহ। দেশী সিপাই সেদিন সংখ্যায় ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার। সবাই বিদ্রোহ করেনি। কিছু দেশী সৈন্য ছিল ইংরাজের অনুগত।

দাক্ষিণাত্যে সৈন্যরা বিদ্রোহে যোগ দিল না। বিদ্রোহ সেখানে তাই প্রবল হয়নি।

উত্তর ভারতেই বিদ্রোহ হল প্রবলতম। কিছু অন্ত্যজ হিন্দু আর শিখরা বাদে সকলে যোগ দিয়েছিল জাতির এই জীবন-মরণ সংগ্রামে। বিদ্রোহের ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিল বেঙ্গল আর্মি। বাংলার গৌরব এই বেঙ্গল আর্মি।

পলাশীর যুদ্ধের একশ' বছর পর—১৮৫৭ সাল।

বিদ্রোহের আগুন প্রথম সুরু হল পলাশীর অনতিদূরে বহরমপুরে। বিদ্রোহীদের অস্ত্রহীন করা হল। স্তব্ধ হল বহরমপুরের বিদ্রোহ।

বারাকপুরে ছিল ৪৭নং ফৌজ। এই ফৌজের মঙ্গল পাণ্ডে নামক সিপাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদ্রোহের প্রথম গুলি ছোঁড়েন। তাই ইংরাজরা পাণ্ডের নাম অনুসারে বিদ্রোহীদের বলত 'পাণ্ডিয়া'।

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাইরা নিহত করল গোরা অফিসারদের। টেলিগ্রামের তার কাটল। রাজপথে ছুটল সিপাইরা—কণ্ঠে বিদ্রোহের জয়গান। ব্যর্থ হল এই বিদ্রোহ যোগ্য নেতার অভাবে।

সিপাইদের ক্ষুদ্র বিদ্রোহ এর আগে আরও দুবার ঘটে। ভেলোরে ১৮০৬ সালে আর বারাকপুরে ১৮২৪ সালে।

বারাকপুরের সিপাইরা বর্মায় যেতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহী হয়। নির্মম হস্তে ইংরাজরা সে বিদ্রোহ দমন করে।

মেদিনীপুরস্থ বিদ্রোহী রাজপুত সৈন্যদের পরিচালক হন একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ। কর্ণেল ফষ্টর উক্ত তেওয়ারি ব্রাহ্মণকে বন্দী করেন এবং স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে তাঁকে ফাঁসি দেন।

কর্ণেল সাহেবের রাজপুত পত্নীর চেষ্টায় বিদ্রোহ বন্ধ হয়।

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার জেলায় জেলায় সেনাদলের ছাউনিতে। চট্টগ্রাম সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল। ১৮ই নভেম্বর ঐ সিপাইরা বিদ্রোহী হয়ে খুলে দিল জেলখানা। তারা রাজকোষ লুণ্ঠন করল।

গোলা-গুলি সহ তারা উত্তর দিকে চলে যায় পার্বত্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে। কারামুক্ত কয়েদী ও স্ত্রীপুত্রসহ তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় পাঁচশত। সিপাইদের ধরবার জন্য ৭৫ টাকা করে পুরস্কার ঘোষিত হল। তারা ধরা পড়ল। চট্টগ্রামে তাদের ফাঁসি হয়। বিদ্রোহের আগুন ছড়ায় বাংলার সর্বত্র।

রাণীগঞ্জ তখন রেলপথের শেষ। বিদ্রোহীরা রাণীগঞ্জ আক্রমণ করল, রেলপথ ধ্বংস করল।

দিকে দিকে চলল বিদ্রোহের জয়গান। বাংলা থেকে বিদ্রোহ উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলায় প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বাংলার বিদ্রোহ শুধু মাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ। এতে জনসাধারণের কোন সমর্থন ছিল না। এই জন্য ইহা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আকার ধারণ করতে পারল না। এই প্রথম মুক্তিযুদ্ধে বাঙালীর অবদান কিছুই ছিল না। বাংলার সিপাহী বিদ্রোহ তাই সত্বর দমিত হল।

ইংরাজের সর্বশক্তির কেন্দ্র ছিল কলকাতা। বাংলার উপর তাই ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষী ও তার জমি তখন জমিদারের অধীন। এই নূতন তৈরি জমিদার-শ্রেণী কায়েমি স্বার্থের জন্য ইংরাজকে সাহায্য করল। জমিদার ত এগোলই না। প্রজারাও এগোতে পারল না সিপাহীদের সঙ্গে জন

সংযোগের অভাবে।

বুদ্ধিজীবিরা অর্থাৎ রাজা রামমোহনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাথীরা ইংরাজী সভ্যতা, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় জাগরণের স্বপ্ন দেখছিলেন। তাদের চিন্তাধারায় এই বিদ্রোহ ছিল সেই জাগরণের প্রতিকূল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের ভদ্রলোকশ্রেণী এই মুক্তি-যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করেন।

শূন্যে মিলিয়ে গেল তাই মুষ্টিমেয় কিছু সিপাহীদের অস্ত্রাঘাত।

ইংরাজ-শোণিতে মধ্য ও উত্তর ভারতের মাটি পিছল! ইংরাজের ঘাঁটি, দুর্গ ধূলায় পরিণত। সমগ্র ভারত থেকে ব্রিটিশ-শাসন উবে গেল কর্পূরের মত। বিদ্রোহী সৈন্য ও জনসাধারণের অধিকারে এল ভারতের রাজধানী দিল্লী। বিদ্রোহীরা দিল্লীর সিংহাসনে বসাল—দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাকে। সম্রাট নিষিদ্ধ করলেন গো-কোরবানি। বিদ্রোহান্তে মুক্ত-ভারতের শাসন-ভার রাজন্যমন্ডলীর হাতে অর্পন করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জমিদার ও প্রজার মিলনে এবং হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিতে পত্তন হ'ল নূতন সরকার। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সুরু হ'ল ইংরাজের পাল্টা অভিযান। বিদ্রোহীদের হাত থেকে খসে পড়ল শহরের পর শহর। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য বিদ্রোহীরা বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করল। সদ্য স্বাধীনতাহারা শিখসৈন্যরা ও নেপালের গোর্খা সৈন্যরা ইংরেজ শাসন কায়েম রাখতে বিদ্রোহ দমনে বিশেষ অংশগ্রহণ করল। তাঁবেদার দেশীয় লোকেদের বিশ্বাসঘাতকতায়, ইংরাজের বিপুল রণ-সম্ভার ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহীদের পরাজয় হ'ল।

নানাসাহেব পালিয়ে গেলেন নেপালে। তাঁতিয়া তোপে ধরা পড়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। বাহাদুর শা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। বীরবালা ঝাঁসির রাণী সম্মুখ সমরে নিহত হলেন। প্রতিশোধের স্পৃহায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করল ইংরাজরা। লুণ্ঠন, হত্যায় ভারতবাসীদের উপর তারা নিল প্রতিশোধ। ভারতের সর্বপ্রান্তে হাহাকার।

ব্যর্থ হল ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ।

॥ নীল বিদ্রোহ ॥

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার চাষী আর মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরাজশাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ। সুদূর উত্তরপথের বীর নায়কদের

রোমাঞ্চকর সংগ্রাম কাহিনী শুনে সবাই উৎসাহিত। শোষিত, নির্যাতীত বাংলার কৃষকদের রক্তেও নাচন লাগে কিন্তু রক্তে রাঙা সংগ্রামের পথ কে দেখাবে তাদের ?

নিরাপদ পথ বেছে নিয়েছেন নেতারা। বাংলার কৃষকদের বিপ্লবের সাথে সংযোগ ছিল না। তাই বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও বিধাতার আশীর্বাদের মত এল জাতীয়তাবোধ। ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতার কলঙ্ক মোচন করল বাংলার নীল-বিদ্রোহ।

এবার বাঙালী পথ দেখাল। নীল-বিদ্রোহের মধ্যে সুরু আর বঙ্গভঙ্গের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ। গোরা সিপাহীদের উদ্যত অগ্নিনালিকার সামনে বিদ্রোহী ভারত ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল। হঠাৎ শোনা গেল বিপ্লবের কণ্ঠ। বাংলার নীলচাষীর সে কণ্ঠ।

সেই কাহিনী নীলবিদ্রোহের কাহিনী। এই কাহিনীর মূল কারণ নীলরঙ। নীলরঙ অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে তৈরী হ'ত এবং দেশ-দেশান্তরে রপ্তানি হত।

পাশ্চাত্য বণিকদের কারসাজিতে বাংলার বস্ত্র-ব্যবসায়, লবণ-ব্যবসায় প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্য বাঙালীর হাত থেকে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকারে চলে গেল। আবার তাদের হাতে চলে যায় বাঙালীর নীল রঙের ব্যবসা। বাংলার চাষী হ'ল শুধু উৎপাদনের মালিক—লাভের মালিক ইংরাজ বণিক। ইংরাজ বণিকরা গ্রামে গ্রামে নীলকুঠী খোলে। নীলের উৎপাদনও খুব বাড়ল। সারা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় নীল বাংলা থেকে সরবরাহ হয়। তার মধ্যে যশোহর, খুলনা, নদীয়ায় নীল চাষ হয় বেশী। সেখানে ঘটে নীল-বিদ্রোহ।

নীল ব্যবসায়ী ইংরাজ বণিকদের বলা হ'ত নীলকর সাহেব। তারা জমিদারদের কাছ থেকে তালুক পত্তনি নিত এবং তালুকস্থ রায়তদের দিয়ে নীল চাষ করাত। রায়তরা দাদন নিয়ে নিজ নিজ জমিতে নীল বুনতে চুক্তি করত। দাদনের নগদ পয়সার উপর চাষীদের প্রথম প্রথম লোভ ছিল। নগদ পয়সার মুখ তারা দেখতে পেত না কোনদিন। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে তাদের সুখেই দিন কেটে যেত। এখন নগদ পয়সার লোভে নীল চাষ করতে ছুটল চাষীরা। নীল চাষীদের প্রথম প্রথম অবস্থা কিছু উন্নত হ'ল কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই সুরু হল তাদের অসীম দুর্গতি।

নীলকর সাহেবদের মধ্যে প্রথম প্রথম পরস্পর একতা ছিল না। তখন তারা রায়তদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিত কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসা স্হায়ী হল, তাদের মধ্যে এল একতা। নীলকর সাহেবদের গঠিত হল' সমিতি। তারা বড় বড় তালুক কিনে মালিক হ'ল। উন্নতির পর উন্নতিতে নীলকর সাহেবদের মাথা ঘুরে যায়। প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যের জন্য তারা মত্ত হ'ল। বাঙালীর উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার শুরু হয়। দেশীয় জমিদারদের মধ্যে যারা তালুক পত্তন অথবা বিক্রয়ের জন্য রাজি হ'ত না তাদের ছলে-বলে-কৌশলে সাহেবরা ভিটেমাটি ছাড়া করত। প্রজারাও নীল চাষ করবার জন্য দাদন নিতে অস্বীকৃত হলে নির্যাতীত হ'ত। আদালতে রায়ত-জোতদারদের অভিযোগের বিচার হ'ত না কিন্তু নীলকর সাহেবদের মিথ্যা অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্হা হ'ত। কারণ বিচারকরা সাহেব, নীলকরদের জাতভাই।

গ্রাম্য লোকদের অসন্তোষ ধিঁকি ধিঁকি বাড়ে। চাষী আর মধ্যবিত্ত-দের কেটে যায় নগদ টাকার মোহ। মধ্যবিত্ত আর জোতদাররা তালুক বিক্রি করতে বা পাওনা দিতে অস্বীকার করল। রায়তরা দেখল সব ফাঁকিজুকি। এত খেটে তারা পায় চার আনা কিন্তু মোটেই না খেটে নীলকর সাহেবরা পায় বার আনা! এত অল্প আয় হয় যে দাদনের টাকাই শোধ হত না। তার উপর জুয়াচুরি—সাদা কাগজে টিপ বা সই। দাদন দশ টাকা দিয়ে নীলকররা লিখে রাখত একশ টাকা। লাভ ত' দূরের কথা—দাদনের টাকা শোধ করতে সারা বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও চাষীদের সর্বস্বান্ত হ'তে হ'ত। চাষীরা বলল—আমরা আর নীলচাষ করব না।

সুরু হয় বাংলার চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। সরকারী কর্মচারীরা, এমন কি খোদ লাট হ্যালিডে সাহেব নীলকরদের সহায়ক হলেন। নীলপ্রধান জেলায় নীলকর সাহেবদের সরকারী অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে লাগলেন হ্যালিডে সাহেব। অত্যাচার ষোলকলায় পূর্ণ হ'ল। অবাধ্য রায়তদের ঘরবাড়ি জ্বালায় নীলকরদের পাইক-বরকন্দাজ ও আমিন-নায়েব। কুঠির গোপন কক্ষে রায়তরা কয়েদ থাকত, অনেক সময় কয়েদীরা গুম- খুন হ'ত।

সাহেবরা জানত বাড়ীর মেয়েদের অপমান করলে বাঙালীরা বড় জব্দ হয়। তাই অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য বাড়ির মেয়েদের

অপমান করা হ'ত। এমন কি মেয়েদেরও কুঠিতে কয়েদ রাখা হত। এক এক কুঠিতে আবার থাকত রামকান্ত বা শ্যামচাঁদ নামক লগুড়। এই লগুড়ের আঘাতে প্রজারা জর্জরিত হ'ত। মধ্যবিত্ত জোতদারদেরও নিষ্কৃতি ছিল না।

অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় চাষীরা বিদ্রোহ করল। চাষীরা বন্ধ করল নীলচাষ। পাইক বরকন্দাজ গ্রামে গ্রামে হামলা করে। গ্রামের লোক লাঠি ধরল। বাধল সংগ্রাম।

কপোতাক্ষ নদীর পাড়ে চৌগাছা গ্রাম। চৌগাছা থেকে অপর পারে মহেশপুর গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আট মাইল পথ। এই পথে কুঠির পর কুঠি। কুঠিগুলো কাঠগড়া-কনসার্ণের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে নীল-চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়। বিদ্রোহও প্রথম সুরু হ'ল এইখানে। বিদ্রোহের নেতা চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। এঁরা প্রথমে ছিলেন নীলকুঠির দেওয়ান। প্রজাদের দুঃখ দেখে কেঁদে ওঠে তাদের প্রাণ। অত্যাচারীর দাসত্ব ত্যাগ করে প্রজাদের পাশে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন। তাঁদের আন্দোলনে কাটগড়া-কনসার্ণের প্রজারা নীলচাষ বন্ধ করল।

প্রজাদের বিরুদ্ধে সাহেবরা আনল চুক্তি-ভঙ্গের মামলা। অনেক প্রজার হ'ল কারাদণ্ড। বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর সারাজীবনের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে মামলা লড়লেন, বন্দী প্রজাদের সংসার চালালেন। প্রজাদের জোট ও মনোবল ভাঙবার জন্য সাহেবদের পাইক-লাঠিয়াল, থানার পুলিশ চাষীদের গ্রাম ঘেরাও করত।

বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বড় বড় লাঠিয়ালের নেতৃত্বে গ্রামের লোকরাও একতাবদ্ধ হ'ল। লড়াই সুরু করল।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রাম্য চাষীর প্রবল সংগ্রামের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতময়। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবির প্রাণে উদ্দীপনা আনল সে সব কাহিনী।

বর্তমান 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তখন তরুণ যুবক। তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের অধিবাসী। বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মত তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রজাদের সংগ্রামে।

নীল-চাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে পরলোগত সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পন" নামক নাটক রচনা করেন।

কলকাতার হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে প্রজার সংগ্রাম কাহিনী প্রচার করতে থাকেন।

প্রজাদের আন্দোলনের পশ্চাতেও তিনি পরিশ্রম করতেন। সাহেবরা তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে। মামলা চলবার সময় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মালদহের রফিক উত্তরবঙ্গে চাষীদের নীল চাষ বন্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। নদীয়ার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার বিদ্রোহের নেতা ছিলেন চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। খুলনার নেতা বারুইখালির রহিমউল্যা লড়াই-এ প্রাণ দেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যত রকমের প্রজা-বিদ্রোহের কাহিনী আমরা জানি তার মধ্যে বাংলার নীল-বিদ্রোহই বিখ্যাত। আর সেই বিদ্রোহে বাঙালী কৃষকের একতা, সামর্থ্য, দেশপ্রেম ও সংগ্রাম আমাদের চমৎকৃত করে। নীল-বিদ্রোহই আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত চেতনাকে মুক্তির কামনায় জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

• সাদা-কালোর ভেদাভেদ •

আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) থেকে আধুনিক ভারতের মুক্তিপথের অগ্রদূত কংগ্রেসের আবির্ভাব (১৮৮৫) পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের জাগরণের যুগ।

এই কালের মধ্যবিন্দু সিপাহী বিদ্রোহ—ভারতের প্রথম ব্যাপক জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম।

জাতীর মর্যাদা রক্ষার প্রথম সোপান তৈরী করলেন রামমোহন।

পরবর্তীকালে ঘটল সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব।

ভারতীয় লোকদের শাসনযন্ত্রে স্থান নাই। বড় বড় চাকরী তারা পায় না। অপরাধী ইংরাজের সাত খুন মাপ।

অসম শাসনের জ্বালায় কাতর সেদিন ভারত। ব্রাহ্মধর্ম মত অন্ধকার গগনে উজ্বল তারার মত দেখা দিল সেদিন। রামমোহনের শিষ্য প্রিন্স দ্বারকানাথ সেদিন জাতীয় মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা নিয়ে অগ্রণী হলেন। ১৮৩৭ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে তিনিই প্রথম স্থাপন করলেন সকল শ্রেণীর লোকের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—জমিদার সভা। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দল মনে করতেন যে ইংরাজের সুশাসন, ইংরাজী ভাষা মারফৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং ইংরাজের যান্ত্রিক শিল্প ঘটাবে এ দেশের উন্নতি। তখনকার নামকরা ছাত্র রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের দলে যোগ দিলেন এবং ১৮৪৩ সালে স্থাপন করলেন দ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি।

ইংরাজী স্কুলের সাহেবরা সুযোগ পেলেই ভাল ভাল ছেলেদের খৃষ্টান করত। হিন্দু, ব্রাহ্ম সকল বাঙালীই সাহেবদের স্কুলে আর ছেলে পাঠাতে রাজি হ'ল না। বাঙালীরা নিজেরা স্থাপন করতে লাগল বিদ্যালয়। হুজুগ চলল চারিদিকে বিদ্যালয় স্থাপনার।

নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যখন শিক্ষা বিস্তার করে হিন্দুয়ানি বজায় রাখছিল, ব্রাহ্মরা তখন সংবাদপত্র আর সমিতি দ্বারা জাতীয় মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছিল। অপরাধী ইংরাজের বিচার হত না সাধারণ আদালতে—হত সুপ্রীম কোর্টে। বিচার করত শুধু ইংরাজ জজ। দেশীয় জজ তাদের বিচার করতে পারত না। ইংরাজদের মধ্যে দু'একজন লোক ছিলেন ভাল—যেমন হেয়ার, বেথুন।

বেথুন সাহেব তখন বড়লাটের সভার সভ্য। তিনি ভারতীয়দের এই অমর্যাদা দূর করবার জন্য ইংরাজ ও ভারতবাসীর একই প্রকার বিচারের সুপারিশ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি আইনের পাণ্ডুলিপি বড় লাটের সভায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পেশ করেন।

জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় এই আইন যাতে পাশ হয় তার জন্য বাঙালীরা সুরু করল আন্দোলন। তাদের দাবী ও আকাঙ্ক্ষার বাণী সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল।

রামমোহনের যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার আহ্বানে যেমন সেদিন অনেক সংবাদপত্র জন্ম নিল তেমন সেদিন এই জাতীয়তার আহ্বানে ভূমিষ্ট

হ'ল ক'খানা সংবাদপত্র—জ্ঞানান্বেষণ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি। এই আন্দোলনের অগ্রণী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয়তার অনুপ্রেরণায় 'জমিদার-সভা' ও 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মিলনে ১৮৫১ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত হ'ল।

সাহেবরাও পক্ষান্তরে বেথুনের আইনটি যাতে পাশ না হয় তার জন্য আন্দোলন করল। তারা এ আইনের নাম দিল 'কালা আইন'। কালা আইন পাশ হল না। কালা আইন পাশ না হওয়ায় শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা বুঝলেন তাঁরা কত অসহায়। যে ইংরাজ শাসনের উপর তাদের ভরসা তা দেশ ও জাতীর জন্য নয়—ইংরেজদের জন্য।

ইংরাজ শাসনের উপর তাদের বিরূপ মনোভাব দেখা দিল। এরই সম-সময়ে এল বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। সব শেষে সিপাহী বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহের পরিণতি বাংলার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের মনে ভীতির সঞ্চার করল এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা ছেড়ে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেন। শোষণের ক্ষেত্রে এরা হল অগ্রণী। স্বার্থের খাতিরে তাঁরা নির্জন পথের ধারে ফেলে দিলেন জাতীয় মর্যাদা।

বাঙালী সমাজে ভাঙাগড়ার খেলা

বাঙালী সমাজের সর্বস্তরে জাগে ভাঙাগড়ার খেলা। এর মূলে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব। একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের নেশা,—আর অন্যদিকে নিজ দেশধর্ম সভ্যতার পথে প্রত্যাবর্তনের ডাক। একদিকে সাহেবিয়ানা,—অন্যদিকে স্বাদেশিকতা।

স্বাদেশিকতার পথে ডাক দিলেন ভূদেবচন্দ্র আর ঈশ্বরচন্দ্র। ভূদেব

প্রচার করতে লাগলেন পারিবারিক ও সামাজিক সুনীতি আর ঈশ্বরচন্দ্র প্রচার করতে লাগলেন বাঙালীর বাঙালীত্ব আর সমাজ সংস্কার। রাজনারায়ণ বসু প্রচার করলেন সাহেবিয়ানার স্থলে হিন্দুয়ানি। কাব্যে আর ছন্দে মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন সেন আর সাহিত্যে দীনবন্ধু, বঙ্কিম সৃষ্টি করলেন বাংলার সর্বস্তরে জাতীয়তা-বোধ। এমনি করে জাগে নূতন বাংলা।....

ইংরাজী শিক্ষার উগ্র প্রভাবে যাঁরা একদিন হাতে নিয়েছিলেন মদের বোতল, ভুলেছিলেন নিজের দেশ, ধর্ম, সভ্যতা, শিখেছিলেন আচারে, ধর্মে, পোষাকে সাহেবিয়ানা তাঁদের অগ্রণী প্রখ্যাতনামা শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু বার্ধক্য দশায় অনুধাবন করলেন ভ্রান্ত পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের ডাক। তিনি নবগোপাল মিত্রের সাথে নামলেন স্বাদেশিকতা প্রচারে।

১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তির দিন তাঁরা হিন্দুমেলা নামক স্বদেশী ভাবোদ্দীপক মেলার অনুষ্ঠান করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির লোকেরা এই মেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এই মেলায় স্বদেশী গান গীত হত এবং দেশী শিল্প ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হত। এভাবে সমাজে প্রচারিত হয় স্বাদেশিকতা।

সেদিন সুরু হয় দেশ-প্রেমাত্মক কর্মযুগের সূচনা। এ যুগের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁরা স্থাপনা করেন 'ভারত-সভা' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই 'ভারত-সভা'। "ভারত-সভা" সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রথম রূপ। "ভারত সভা"র আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা। সরকারের সহিত অসহযোগ নীতি ছিল পরিকল্পনা।

"ভারত-সভা"র নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন। অন্যান্যরা কেহই সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন না।

কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করেন ১৯৩০ সনে। ১৯২১ সনে সুরু করে অসহযোগ আন্দোলন। বাঙালী পূর্ণ স্বাধীনতার চিন্তা করেছিল। তাই গোখলে একদা বলেছিলেন—বাঙালী আজ যা ভাবে বাকি ভারত ভাবে তা কাল।

বাঙালী প্রথমে ভেবেছে আরও একটা জিনিষ—কৃষক ও মজুর

আন্দোলন। নীল বিদ্রোহে বাংলার কৃষকই প্রথম শোনাল শোষিতের আর্তনাদ ও সংগ্রামের কাহিনী।....

সুদূর আসামের চা-বাগানে ভারতীয় কুলিদের উপর লোকচক্ষুর অন্তরালে যে অপরিসীম নির্যাতন চলত তা ভারত-সভার নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী শ্রমিকের ছদ্মবেশে অনেক সময় জীবন বিপদাপন্ন করে জেনে আসেন এবং সর্বসাধারণে তা প্রকাশ করেন।

প্রখ্যাত বক্তা বিপিন পাল, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও নেতা ডাঃ মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতির চেষ্টায় চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার কথা আসামের চিফ্ কমিশনার হেনরি কটনের মনযোগ আকর্ষণ করে। তাঁর চেষ্টায় আড়কাটির অত্যাচার কমে যায় এবং বাধ্যতামূলক কাজ করবার আইন লুপ্ত হয়।

চা-বাগানের অসহায় কুলিদের নিয়ে যখন বাংলার নেতারা আন্দোলন করছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষ ও ইলবার্ট বিল বাংলা তথা ভারতে প্রবল উদ্দীপনা আনে।

দক্ষিণভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার দুর্ভিক্ষ রোধের কোন চেষ্টাই করল না। উপরন্তু দুর্ভিক্ষের সাহায্য কার্যের জন্য যে টাকা সরকারের হাতে ছিল তা দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যয় না করে আফগান যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হয়। বাঙালী তার ভারতবাসী ভাইদের দুঃখে সংবাদপত্র মারফৎ প্রবল আন্দোলন চালায়। সংবাদপত্রের এই তীব্র আন্দোলন সরকারকে ভয়াতুর করল। দেশীয় ছাপাখানার উপর নানাবিধ বিধি-নিষেধ বসালেন বড়লাট লিটন সাহেব এবং পাশ করলেন সংবাদপত্র দমন আইন। দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। শুধু এই নয়। আরও নির্যাতন সুরু হ'ল। পাশ হ'ল 'আর্মস্ অ্যাক্ট'। বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হ'ল। ক্ষুব্ধ হ'ল ভারতের লোক। এল ইলবার্ট বিল। আগে দেশীয় বিচারকরা সাহেবদের বিচার করতে পারতেন না। বড়লাট রিপন এই বৈষম্য দূর করবার জন্য তাঁর আইন-সচিব ইলবার্টকে আইন প্রণয়নের ভার দেন। ইলবার্টের বিল পাশ হ'ল কিন্তু যে আকারে পাশ হ'ল তাতে ভারতবাসীরা খুসী হ'তে পারল না। ভারতবাসী হ'ল আরও ক্ষুব্ধ। নেতা সুরেন্দ্রনাথের হ'ল কারাদণ্ড। দেশময় বিক্ষোভ দেখা দিল। প্রবল আলোড়নের মধ্যে কলকাতায় বসল 'ভারত-সভা'র পরিকল্পিত সর্বভারতীয় সম্মেলন—জাতীয় সম্মেলন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের বড়দিনে।

ইতিমধ্যে পাবনা জেলার অত্যাচারিত কৃষকরা জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই কৃষক আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের অগ্রগতিতে ভয় পেল ইংরাজরা। সরকারী গোপন সাহায্যে ইংরাজদের নেতা হিউম সাহেব পাল্টা সম্মেলন আহ্বান করলেন পর বৎসর যখন সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সুরু হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা শহরে জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসল, আর ঠিক সেই সময়ে হিউমের আহুত 'কংগ্রেস' সম্মেলন বসল বোম্বাই-এ।

বাংলা তখন নবজাগরণের কেন্দ্র। বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এই কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা হ'ল। তবুও "জাতীয়-সম্মেলন" এর মত জনপ্রিয়তা লাভ করল না, কারণ জনপ্রিয় নেতারা ছিলেন এই সম্মেলনে। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন (১৮৮৬) তাই জাতীয় নেতাদের নিয়ে হ'ল। বাঙালীর জাতীয়তার সাধনার মধ্য দিয়ে জন্ম হল কংগ্রেসের।

বিবেকানন্দের দেশসেবা ও দেশ গঠনের মন্ত্র

পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে মোহমুক্তি ঘটাল দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। নাস্তিক ও বিধর্মীরা তাঁর কাছে এসে পেলেন সত্যের সন্ধান।

কলকাতার সিমলা পল্লীর এক তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রতিভাবান, সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিন্তু নাস্তিক, ভারতীয় সভ্যতার উপর আস্থাহীন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে এঁর নাস্তিকতা এবং স্বধর্মের প্রতি অনাস্থার ভাব কেটে যায় এবং

তিনি হন রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ও তাঁর পরবর্তী নাম হয়—স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ডাক দিলেন দেশ-সেবা ও দেশ-গঠনের আহ্বান। স্বাদেশিকতার মহান এক চেতনা, দুর্জয় এক সংকল্পের ইসারা দিলেন তরুণ এই সন্ন্যাসী। তাঁর বলিষ্ঠ হৃদয়, সংস্কৃত মন বিমূঢ় বাঙালীর সামনে তুলে ধরলেন এক নূতন আদর্শ, এক নূতন পথ।

বাঙালীরা পশ্চিম দিক থেকে তাকাল পূর্বদিকে। তাকাল নিজের দেশের পানে কিন্তু চলার পথে সঙ্কোচের ভাব—বুকে সংশয়, দ্বিধা··· চোখে ভীরুতা। সেদিন বিবেকানন্দের বজ্রকন্ঠ ভারতবাসীর বুকে আঘাত দিয়ে ভাঙল এ সঙ্কোচ, শোনাল নূতন বাণী—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

বিবেকানন্দ বললেন, তোমরা ভারতবাসী। তোমরা কারো চেয়ে ছোট নও। সাময়িক পরবশতায় তোমরা নীচু হয়ো না। তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ শুনিয়েছেন নূতন নূতন জ্ঞান ও কর্মের বাণী। আজ তোমরা এই ক্ষুধার্ত, লোভী, দস্যু পশ্চিমকে শোনাবে আধ্যাত্মিকতা ও শান্তির বাণী। জাগো···উঠ····। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল মূক ভারতের বাণী পশ্চিমের দ্বারে দ্বারে। প্রতীচ্যের শত শত মানুষ নত হ'ল সেই গৈরিক বসনের সামনে, উন্নত উষ্ণীষের তলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংক্রান্তি····বিংশ শতাব্দী সম্মুখে—সেই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন রাজা রামমোহন রায়ের হাতে গড়া, তেমন বিংশ শতাব্দী স্বামী বিবেকানন্দের হাতে গড়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব এল ভারতের চিন্তা জগতে রাজা রামমোহন রায়ের বাণীতে। আর বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব এল ভারতের কর্ম-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে। চিন্তার পর কর্ম। কর্ম-দেশের আসল রূপ। তাই আধুনিক ভারতের রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্মসভা বস্‌ছে। সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত। শুধু হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধির কাছে নিমন্ত্রণ এল না। এ অপমান অনেক ভারতবাসীর বুকে বাজল। মাদ্রাজের কতিপয় ব্যক্তি ঐ ধর্মসভায় ভারতের হিন্দুদের পক্ষে

প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য পাঠালেন স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী বোম্বাই ত্যাগ করলেন এবং জাপান হয়ে চিকাগো চললেন। বিদেশ জায়গা, সবই অজানা। ধর্মসভায় তিনি অনিমন্ত্রিত। কিন্তু ভারতের এই সন্ন্যাসীর বুকে সেদিন জ্বলছে আগুন। অনেক চেষ্টার পর তিনি পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দেবার অনুমতি পেলেন ধর্মসভায়।

চিকাগোর ধর্মসভার বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন, উন্নত উষ্ণীষ। আমেরিকার লোকেরা একটু চঞ্চল হ'ল। মঞ্চে তারা দেখল একজন বক্তা অপর বক্তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখমণ্ডলে কি প্রশান্ত, গম্ভীর, উদার ভাব—ধারণা করা যায় না—অথচ নীচু হয়ে আসে মাথা। মিষ্টি গলায় উদাত্ত আহ্বান এল—ভগ্নি ও ভ্রাতৃবৃন্দ। এত আপনার করে আর কেউ ত' ডাকেননি তাদের। সবাই করেছেন নিজের ধর্মের বড়াই। ভারতের লোক, হিন্দুধর্মের লোক আপনার করে ডাকলেন সবাইকে। কি মধুর ডাক!

পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। শ্রোতারা আত্মহারা হয়ে শুনছেন বিবেকানন্দের বক্তৃতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। আমেরিকার লোকেরা বিবেকানন্দের বক্তৃতায় পাগল। অন্যান্য একঘেয়ে বক্তৃতা তাঁরা শুনতে চাইতেন না। ধর্মসভার অনুষ্ঠানে তাঁদের আগ্রহ রাখবার জন্য উদ্যোক্তারা বিবেকানন্দের বক্তৃতা সব শেষে দিতেন। তাঁর বক্তৃতার জন্য শ্রোতারা অগত্যা সভায় শেষ পর্যন্ত থাকতেন। ভ্রান্ত-ধারণায়, বিকৃত প্রচারে হিন্দুধর্ম প্রতীচ্যে ছিল অবহেলিত। বিশ্ব-ধর্মের সেই সভায় অবহেলিত, অনিমন্ত্রিত ধর্ম পেল শ্রেষ্ঠ আসন।

দেশের লোক চিনত না নিজের দেশকে। তিনি তাদের শোনালেন—ভারতের মাটি তোমার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। মেয়েদের সামনে তিনি ধরলেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ। ভারতের শ্রমিকদের তিনি জানালেন প্রণাম। পদদলিত মানুষের সেবাই স্বামীজীর ধর্ম।

নর-নারায়ণের সেবার জন্য তিনি খুললেন গুরুর নামে দুটো আশ্রম—বেলুড়ে একটি 'রামকৃষ্ণ মিশন' আর আলমোড়ার নিকট মায়াবতীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এই দুই আশ্রমে তিনি তৈরী করতে চাইলেন একদল সর্বস্বত্যাগী প্রচারক যারা গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলো—মানবতার বাণী।

দেশ ও দেশের মানুষের উপর ছিল তাঁর এত অটুট দরদ।

শ্রান্তিহীন পরিশ্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাওয়া বদলের জন্য তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইউরোপে যান এবং ফিরে আসেন পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে। ফিরে এসে আবার তিনি দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন কিন্তু বাল্যের ব্যাধি আর রেহাই দিল না তাঁকে। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন যোগসাধনার বলে এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। বিবেকানন্দ সেই শক্তিটুকু লাভ করেন রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। সেই শক্তির বলে তিনি ভারতের যুগ-সাধনাকে নিয়ে এলেন—আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম ও মুক্তির পথে।

পতিত মানবের মুক্তিকামনা হ'ল সেদিন থেকে ভারতের ধর্ম। শক্তির সাধনা শিখল ভারত। ভারতের পায়ের শিকল নড়ে উঠল। বাঙালী, মারাঠি, শিখের হাতে উঠল রিভলবার। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলেন তাঁরা জীবনের জয়গান। আসমুদ্র হিমাচল জেগে উঠল অহিংস নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর জয়গানে। ইংরাজের কামান গোলার সামনে মরল ভারতের হাজার হাজার যীশু। ছিঁড়ল শিকল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা আন্দোলনে বিপ্লবের রূপ

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালী পুরাতন কুসংস্কার ত্যাগ করে নূতন সংস্কারের বশ হল। বেশভূষা, আহার-বিহারে এবং আচার অনুষ্ঠানে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণে বাঙালী সেদিন মত্ত। বাঙালীর সমাজে এল ইংরাজ বণিকের সংস্পর্শে রুচি-বিকৃতি, নীতি-ভ্রষ্টতা ও আধ্যাত্মিক সঙ্কট।

ভূদেব, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের শিক্ষা আনল বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার মহাপ্লাবন।

কংগ্রেসের সেদিন আবেদন-নিবেদনের পথ। পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের মত বঙ্গদেশের এ পথ ভাল লাগছিল না।

পরাধীন মানুষদের সংগ্রামের কাহিনী ইতালীর স্বাধীনতার পূজারী ম্যাটসিনি, গারিবল্ডির মহান্ আদর্শ, আয়ার্লণ্ডের মুক্তিকামী শহীদদের মরণজয়ী আত্মদান, অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের দুর্জয় সংকল্প শোনে ভারতের তরুণদল, তারাও চিন্তা করে সশস্ত্র বিপ্লবের।

অত্যাচারী সাহেব হত্যা করে মারাঠাদেশে চাপেকার ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। আনন্দমঠের অনুকরণে বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে তৈরী হল গুপ্তসমিতি। বরোদা থেকে বিপ্লববাদের কর্মপন্হা নিয়ে অরবিন্দ এলেন জন্মভূমি বঙ্গদেশে। আগুনের বাণী ছড়ালেন সর্বত্র। বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আঁৎকে উঠে ইংরাজ রাজপুরুষরা।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি বঙ্গদেশকে দু'ভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ দু'ভাগ হ'ল।

বাঙালীর প্রতিবাদের উত্তরে বড়লাট জানালের—বঙ্গভঙ্গ রদ হতে পারে না। এ ঠিক হয়ে গেছে।

বাঙালীর নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বললেন, Surrender not. তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—ঠিককে আমরা বেঠিক করবই।

সেদিন বিংশ শতাব্দীর শুরু। বিংশ শতাব্দীকে অভ্যর্থনা জানায় বঙ্গদেশের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। কার্জনের দাম্ভিক নির্দেশের প্রতিবাদে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন অদমনীয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের জনক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে বিগত অর্ধশতাব্দীর সংগ্রাম নিল বিপ্লবের রূপ।... বঙ্গদেশের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে কর্মচঞ্চল হয় বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি। শিবাজীর দেশ মহারাষ্ট্রে চলছিল মুক্তি-যজ্ঞের আয়োজন। গণপতি আন্দোলন ও শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে সেখানকার বিপ্লবাত্মক আয়োজন সুরু হয়। বালগঙ্গাধর তিলক, দুই ভাই চাপেকার ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন সে আন্দোলনের নায়ক। দামোদর চাপেকার ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন রাত্রে র‍্যাণ্ড ও আয়াষ্ট নামক দুজন

অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীকে নিহত করে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন। ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে ইহাই প্রথম ফাঁসি।

সাগরপারের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও নাগরিকদের মধ্যে এ সময়ে প্রচারিত হয় নানান সূত্রে বিপ্লববাদ। এই বিপ্লবের প্রদ্যোক্তা হলেন কাথিয়াবাড়ের শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও ধনী পার্শি মহিলা ম্যাডাম কামা।

মারাঠাদেশে সেদিন চলছিল পূর্ণ স্বাধীনতার কামনায় বিপ্লববাদের সাধনা। এই মারাঠা দেশেই বরোদার বৈপ্লবিক নেতা ঠাকুর সাহেবের নিকট বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন শ্রীঅরবিন্দ।

আনন্দমঠের অনুকরণে বঙ্গদেশের শহরে, গ্রামে তৈরী হয় বহু বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও তারক পালিত প্রমুখ নেতাদের ছিল একটি দল। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র সংগঠিত 'হিন্দু-মেলা' ছিল বিপ্লববাদের আর একটি কেন্দ্র। পরবর্তীকালে ব্যারিষ্টার পি, মিত্র স্হাপন করেন "অনুশীলন সমিতি", বিপিন গাঙ্গুলী স্হাপন করেন "আত্মোন্নতি সমিতি" আর অরবিন্দ, বারীন্দ্র স্হাপনা করেন "যুগান্তর" দল। এ ছাড়া শহরে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় নানান্ নেতার গুপ্তসমিতি। বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট বিপ্লবীদলগুলোকে সংহত করেন শ্রীঅরবিন্দ।

বিপ্লবিক সমিতি 'যুগান্তর'-এর কাগজ 'যুগান্তর', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরদার 'নব-শক্তি, আর অরবিন্দের ইংরাজী কাগজ 'বন্দেমাতরম্' জ্বলন্ত ভাষায় লিখতে লাগল সরকারের নিগ্রহ আর অনাচারের কথা। প্রচার করতে থাকল বিপ্লবের মন্ত্র। জনসাধারণের মধ্যে জাগে প্রবল উদ্দীপনা। বঙ্গভঙ্গের গণ-আন্দোলনের সংগ্রাম বিপ্লবের মূর্তি ধারণ করল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বঙ্গদেশের নীল চাষীরা লড়াই করল শোষক নীলকর সাহেবদের সাথে। শোষিত, নিপীড়িত চাষীদের ব্যথা ও বেদনা শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে নূতন তরঙ্গের ঢেউ তুলল। নূতন জীবন পেল বঙ্গদেশ। হেম, মধু, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, নবীন ও রঙ্গলালের লেখনীতে আর দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন ও পরমহংস দেবের ধর্ম-বাণীতে বাঙালীর একতারাতে বেজে উঠল নূতন সুর।

এল স্বাদেশিকতা ও স্বদেশীভাব। সাহেবদের বুটের লাথি আর বাঙালীর সহ্য হয় না। স্বদেশী দ্রব্য প্রচার ও শক্তিচর্চার আন্দোলন

আরম্ভ হল। জন্ম নিল সুরেন্দ্রনাথের 'ভারত সভা'—সারা ভারত ব্যাপী সংগঠন। সাহেবরা আর সাহেব-ঘেষা লোকরা পাল্টা তৈরী করল 'কংগ্রেস'। কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করবার জন্য কংগ্রেসের পাণ্ডারা 'ভারত-সভা'র নেতাদের আনলেন কংগ্রেসে। বিপিন পাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী তুললেন কংগ্রেসে আসামের চা-মজুরদের নিপীড়নের কথা।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাকা সংগঠনে কংগ্রেসকে বড় করলেন। আরও অনেক বাঙালীর মাথা কংগ্রেসকে দিচ্ছিল নূতন রূপ। কংগ্রেস কিন্তু চল্‌ছিল সেদিন আবেদন-নিবেদনের পথে।

বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের কিন্তু এসব ভাল লাগছিল না। সম্মুখে তাদের "ঋষি বঙ্কিমের" 'আনন্দ মঠ'—মুক্তি সংগ্রামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। অন্তরে তখন উঠেছে বিবেকানন্দের কম্বুনাদ,—আত্মশক্তির উদ্বোধন। সাগরপারের পরাধীন মানুষদের সংগ্রামের কাহিনী ভেসে আসছে এপারে। ইতালীর স্বাধীনতার পূজারী ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির মহান আদর্শ, আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিকামী শহীদদের মরণজয়ী আত্মদান। অত্যাচারীর অত্যাচারের শোধ নেবার জন্য রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের দুর্জয় সঙ্কলপ শোনে তারা—হয় চঞ্চল। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে তৈরী হতে লাগল আনন্দমঠের অনুকরণে গুপ্তসমিতি। বিবেকানন্দের বাণী বাঙালীর মরণভয় দূর করে।

মারাঠী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত সাদার রক্তে রঞ্জিত হয়। তাঁরা চুম্বন করলেন অত্যাচারীর ফাঁসিকাঠ। আর আবেদন-নিবেদন নয়! এবার সংগ্রাম! তরুণদের মনে জাগল দুর্জয় সঙ্কলপ।

সুদূর মারাঠা দেশে অরবিন্দ সেদিন বই-এর পাহাড়ের মধ্যে ডুবে আছেন। কানে ভেসে এল তাঁর এই নব জীবনের ক্রন্দন। মুখ তুলে চাইলেন তিনি নিজের জন্মভূমি বঙ্গদেশের দিকে। আনন্দমঠ আর বিবেকানন্দের বাণীতে আগুন লেগেছে সে দেশে কিন্তু সে আগুন জ্বলেছে সমাজের উচ্চস্তরে....নিম্নস্তরে সে আগুন জ্বলছে না।

তিনি বললেন—Wanted more repression. আরও অত্যাচার চাই। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে ইংরাজের ব্যাটন চলবে তবে ঐ আগুন লাগবে ঘরে ঘরে। তিনি এলেন ছোট ভাই বারীন্দ্রকে সঙ্গে করে বঙ্গদেশে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দু'বছর তিনি ঘুরলেন বঙ্গদেশের জেলায় জেলায়। গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখে তিনি ঘুরে

বেড়ালেন বঙ্গের সর্বত্র। বিচ্ছিন্ন গুপ্ত-সমিতিগুলো এক করবার কথা তিনি ভাবলেন। একাজে ব্রতী হলেন তাঁরই নির্দেশে তাঁর ছোট ভাই বারীন ঘোষ। বঙ্গদেশে বিপ্লববাদের দানা বাঁধে। সেই বিপ্লববাদের নেতা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

এই সময় বড়লাট কার্জন ঘটালেন বঙ্গ-ভঙ্গ। বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যথা বঙ্গ-দেশের বুকে এক দারুণ বিপ্লব আনল।

বাঙালী বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন করে ইংরাজকে দিতে চাইল আঘাত। কংগ্রেস তা সমর্থন করল না। বাঙালী একাই চলল তার সংগ্রামের পথে। রাস্তায় রাস্তায় চলল বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। বঙ্গদেশে বিপ্লববাদ পেল কর্মের সুযোগ।

বারীন ঘোষ বার করলেন 'যুগান্তর' কাগজ। এই কাগজের আড্ডায় বঙ্গদেশের বিচ্ছিন্ন গুপ্তসমিতিগুলো মিলিত হ'ল। বোমা আর পিস্তল দিয়ে দেশোদ্ধার করতে হবে এই হ'ল তাদের পণ। বঙ্গদেশে সুরু হ'ল সরকারের নির্যাতন। বিপ্লবীরাও প্রতিশোধ নেবার জন্য ছুটলেন বোমা আর রিভলবার হাতে। পূর্ববঙ্গের লাট ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার বধের আয়োজন হ'ল। কিন্তু বিপ্লবীরা সফল হ'ল না। ছাত্রদের জন্য স্থাপিত হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীঅরবিন্দ।

কংগ্রেস দুটো দলে বিভক্ত হল—'নরমপন্থী' ও 'গরমপন্থী'। এই গরমপন্থী দলের অন্যতম নায়ক শ্রীঅরবিন্দ।

ছাত্রদের উপর আরম্ভ হ'ল সবচেয়ে চরম নির্যাতন। আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের প্রকাশ্য আদালতে বেত মারা হ'ত, স্কুল-কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব আন্দোলন-কারী ছেলেদের প্রকাশ্য আদালতে বেত মারবার আদেশ দিতেন। কলকাতায় কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতি কিংসফোর্ড সাহেবের বিচারের ভার দিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও অপর দু'জন নেতার উপর। গুপ্ত সমিতির বিচারে কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে।

কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতির নির্বাচিত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই দণ্ড দিতে মজঃফরপুরে গেলেন। কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ী মনে করে তারা দু'জন নিরীহ মেমসাহেবকে মারলেন। পুলিশ বঙ্গদেশের

বিপ্লবীদের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু লোককে ধরে ফেলল। অরবিন্দও বাদ গেলেন না। হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ তাঁকে নিয়ে ভ্যানে তুলল।

সে অপমান বাঙালী কোনদিন ভোলেনি। দীর্ঘ বিনিদ্র রজনীর তপস্যায় তাই ত' তার দ্বারে এসে পেঁছাল স্বাধীনতার আলো।

১৯০৮ সালের ২রা মে অরবিন্দ ধরা পড়লেন এবং দীর্ঘ এক বৎসর কারাবাসের পর তিনি আলিপুর বোমার মামলায় প্রমাণাভাবে খালাস পান। এই মামলার বিচারক জজ বিচক্রিফট আই, সি, এস অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। আর ভাগ্যের পরিহাসে সেদিন তার চেয়েও কৃতী সতীর্থ তাঁরই সামনে কাঠগড়ার আসামী। আর অরবিন্দের পক্ষে আইন-জীবি ছিলেন তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ।

শ্রীঅরবিন্দ নির্জন কারাবাসে যোগ-সাধনা অভ্যাস করেন। মুক্তির পর তিনি রাজনীতিতে আবার নামলেন কিন্তু তাঁর রাজনীতি গরম-পন্হী। রাজনীতিতে তখন গরমপন্হীর স্হান ছিল না। বঙ্গদেশের সংগ্রামী শক্তি তখন প্রাচীরের অন্তরালে। এর মোড় ঘোরাবার জন্য ১৯০৯ সনের মে মাস থেকে ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় একবছর তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। অবশেষে ইংরেজ রাজত্ব ত্যাগ করে ফরাসী রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে যোগ সাধনার পথ ধরলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) ও বাংলার বিপ্লববাদ

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর—বংলা ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সাল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের আদেশ দেন। ১৯০৫ সালের পূর্বে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে ছিল সুবৃহৎ বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের জনমত উপেক্ষা করে কার্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ দিলেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। আর বিহার-উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, প্রেসিডেন্সি বিভাগ আর বর্ধমান বিভাগ নিয়ে গঠিত হ'ল বঙ্গদেশ। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী হ'ল ঢাকা।

ভারতের রাজধানী যেমন ছিল কলকাতায় তেমনি রয়ে গেল। আর কলকাতায় বেলভেডিয়ারে রয়ে গেল বড়লাটের আবাস। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করবার জন্য বিপ্লবীরা খুঁজতে লাগল সংগ্রামের পথ।

আমেরিকা প্রবাসী চৈনিকদের বিরুদ্ধে এ সময় আমেরিকা সরকার এক আইন প্রণয়ন করেন। এর প্রতিবাদে ডাঃ সান ইয়াত চীনে আমেরিকার পণ্য-বর্জন আন্দোলন সুরু করেন। এই দৃষ্টান্ত বাঙালীর চোখ খুলে দিল।

"সঞ্জীবনী" পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলাতী পণ্য-বর্জন আন্দোলন সুরু করবার প্রস্তাব দিলেন। সারা বঙ্গদেশে পড়ে গেল বিলাতী পণ্য বর্জনের সাড়া।

স্বদেশপ্রাণ ব্যবসায়ীরা দেশী কাপড় আমদানী করল। মুক্তি-পাগল কলেজের ছেলেরা ঘাড়ে ক'রে দেশী কাপড় বিক্রি করে। ভীরু কংগ্রেস বিলাতী বর্জন আন্দোলন সমর্থন করল না। বিলাতী বর্জনের বদলে স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে। বাঙালী একাই চলল সংগ্রামের পথে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে এ আন্দোলন জোরালো হ'ল। গোলদীঘিতে এক বহ্ন্যুৎসবে ষোল সের কেরোসিন পোড়ে, আর সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। বিলাতী কাপড় পুড়ে ছাই হ'ল।

এই সময়ে বসল বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশন। সরকার শহরে সর্বপ্রকার শোভাযাত্রা ও "বন্দেমাতরম" ধ্বনি নিষিদ্ধ করল। বঙ্গদেশের জনসাধারণ এ আদেশ মানল না। নেতারা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রকাশ্য রাজপথে "বন্দেমাতরম" ধ্বনির সঙ্গে ১০ই মার্চ প্রাতে (১৯০৭) শোভাযাত্রা বার করলেন। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্‌টোবর তারিখ বাংলা ৩০ শে আশ্বিন, বঙ্গদেশ দু'ভাগ হ'ল। সেদিন কারো ঘরে উনুন জ্বলল না। সেদিন হ'ল বঙ্গদেশে 'অরন্ধন দিবস'। দিকে দিকে সেদিন অনুষ্ঠিত হ'ল প্রতিবাদ-সভা। সভায় চাঁদা তোলা হ'ল। এই চাঁদায় স্থাপিত হ'ল

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার। সেই টাকায় অখণ্ড বঙ্গ-ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হ'ল। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে স্থাপিত হ'ল মিলন-মন্দিরের ভিৎ।

তরুণদের পিছনে এসে দাঁড়াল বঙ্গদেশের ছাত্রদল। তারা বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করে। কলকাতার বড়বাজারে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা ঘোষণা করলেন,—আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের স্কুল-কলেজ থেকে বার ক'রে দেওয়া হ'ক। চারিদিকে হ'তে লাগল ছাত্রদের নিগ্রহ।

নিগ্রহ চরমে উঠল মাদারীপুরে। ছোটলাট ফুলারকে অসম্মান করবার কল্পিত অপরাধে মাদারীপুরের কতিপয় ছাত্রকে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট্ বিদ্যালয় হ'তে বিতাড়িত করেন। প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত চাকুরী ত্যাগ করেন।

শিক্ষাবিভাগের ছাত্রনিগ্রহের সারকুলারের বিরোধী সমিতি গঠিত হ'ল এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেন। কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ'লেন শ্রীঅরবিন্দ।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম', 'যুগান্তর' প্রভৃতি সংবাদপত্র জ্বলন্ত ভাষায় লিখতে লাগল সরকারের নিগ্রহ আর অনাচারের কথা।

একটি প্রবন্ধের জন্য ব্রহ্মবান্ধবের জেল হ'ল। জেলের হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এতে জনসাধারণের উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায়।

সরকারের রোষ পড়ল সংবাদপত্রের উপর। "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি বৈপ্লবিক লেখার জন্য সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বৎসর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। "বন্দেমাতরম" পত্রিকায় "ভারতবাসীর জন্য ভারত" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বিপিন পাল পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। বিপিন পালের মামলা সুরু হ'ল কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। কাঠগড়ায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা বিপিন পাল। বিদেশীর হাতে প্রিয়তম নেতার এই বিচারের প্রহসন দেখবার জন্য কাতারে কাতারে লোক

আদালতে জমায়েত হয়। আদালতের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। ভিড় সরাবার জন্য পুলিশ লাঠি চালায়। মার খেয়ে জনতা হটে যায় কিন্তু একটি কিশোর বালক হটল না। সে নীরবে সাহেবদের অপমান হজম করল না। প্রহরারত গোরা হেনরীকে সে পাল্টা আক্রমণ করল। কিশোরের নাম সুশীল সেন। কিশোর বালক সুশীল সেনের উদ্যত হাতে পড়ল হাতকড়ি।

আবার সেই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত। বিচারক কুখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেব। আসামী চৌদ্দ বছরের ছোট ছেলে সুশীল। বিচারে চৌদ্দ ঘা বেত মারার আদেশ হ'ল। ইংরাজ জল্লাদের হাতের পুরু, লম্বা, কঠিন বেতের এক একটি ঘা বালকের পিঠে পড়ে। পিঠে কাল দাগ পড়ে যায়, চামড়া কেটে রক্ত পড়ে।

বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল মানিকতলায় মুরারীপুকুর রোডে বারীন ঘোষের নিজস্ব বাগান বাড়ীতে। হাতে-কলমে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুরু করার জন্য বিপ্লবীরা মানিকতলা বাগানে আস্তানা করলেন। মানিকতলা বাগান হ'ল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আড্ডা। মেদিনীপুরের উদ্যোগী কর্মী হেমচন্দ্র কানুনগো নিজের বাড়ি ঘর-দোর বিক্রি করে জার্মানে যান বোমা তৈরি শেখবার জন্য এবং ফিরে এসে এই আড্ডায় যোগদান করেন। হেমচন্দ্রের হাতে তৈরি হয় বোমা।

এই আস্তানা থেকে সুরু হয় বঙ্গদেশে প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা—পশ্চিমঙ্গের লাট ফ্রেজার বধের তিনবার চেষ্ট হয়, গোয়ালন্দে ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ এলেন সাহেবের উপর আক্রমণ, কুষ্টিয়ায় পাদরি রেভাঃ হিকেনের উপর আক্রমণ, চন্দননগরে মেয়রের উপর আক্রমণ এবং সর্বশেষে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা। দুর্গম বিপ্লব পথে বাঙালীর অভিযান সুরু হয়। দুই বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দলের নির্দেশে গেলেন মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে।

৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮; সন্ধ্যাবেলা। কিংসফোর্ড সাহেবের বাংলোর সামনে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দুই কিশোর বিপ্লবী—হাতে বোমা, কোমরে রিভলবার। সহসা অদূরে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ির খট্‌খট্ আওয়াজ। তড়িৎবেগে বিপ্লবীরা প্রস্তুত হন। গাড়ির উপর বোমা ফেলে তাঁরা পরস্পর বিপরীত দিকে প্রস্থান করেন।

সৌভাগ্যবান কিংসফোর্ড সে গাড়িতে ছিলেন না—ছিলেন ব্যারিষ্টার কেনেডির পত্নী ও কন্যা। তাঁরা প্রাণ হারালেন।

অন্ধকার রাত্রি। বিদেশ। অচেনা পথ ঘাট, অন্ধকার পথ। সারারাত্রি পথ হেঁটে চলেছেন ক্ষুদিরাম। পথশ্রমে পরিশ্রান্ত....শুষ্ক মুখ। সারা রাত পথ হাঁটলেন। রাত ভোর হ'ল।

বেলা বাড়ে। ক্ষুদিরাম ওয়াইনি স্টেশনের নিকটে একটি দোকানে এসে বসে পড়লেন। গুড় মুড়ি খেয়ে জলপান করছেন—এমন সময় স্টেশনের পাহারাদার সাদা পোষাকপরা পুলিশ সন্দেহ বশতঃ তাঁকে গ্রেফ্তার করল।

গুপ্তসমিতির খবরাখবর জানবার জন্য পুলিশ তাঁর উপর অসীম নির্যাতন করল। ক্ষুদিরাম আদর্শ বিপ্লবী। তাঁর কাছ থেকে একটি কথাও বার হ'ল না। বিচারে ক্ষুদিরামকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হল।

এগারই আগষ্ট (১৯০৮)। মজঃফরপুরের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম দিলেন প্রাণ।

গ্রাম-গ্রামান্তরে, বাংলার মাঠে-প্রান্তের সেদিন বাঙালী চারণের কণ্ঠে যে গানের সূত্রপাত হয় তা আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে, কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়—

একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি—
ক্ষুদিরামের হ'বে ফাঁসি।

আর প্রফুল্ল! প্রফুল্ল তখন কোথায়?

১লা মে, ১৯০৮। মোকামাঘাটের স্টেশনের প্লাটফর্মে তাঁর জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হয়। প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের মত খেয়ালী ছিলেন না। তাঁর বয়স ছিল আরও কম। প্রফুল্ল সতের বছর বয়সের কিশোর। তিনি সোজা ট্রেনে চেপে সেদিনই রাত্রির অন্ধকারে কলকাতার পথে রওনা হলেন। মাঝে সমস্তিপুর স্টেশন। এখানে ট্রেন বদল করতে হয়। সমস্তিপুর স্টেশনে প্রফুল্ল জামাকাপড় বদল করছেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সি, আই, ডি ইনস্পেকটরের চোখে পড়ল তা। তিনি প্রফুল্লের পিছু নিলেন।

ট্রেন আবার চলে। নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীর কামরায় উঠে তাঁর সঙ্গে ভাব করেন। মোকামাঘাটে নেমে প্রফুল্ল চাকী দেখলেন একদল

পুলিশ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফ্তার করতে উদ্যত।

পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করা হেয় মনে করলেন প্রফুল্ল চাকী। কোমরের রিভলবার মুখের মধ্যে পুরে তিনি ছুঁড়লেন গুলি। বিপ্লবীর জীবন্ত দেহ স্বদেশীয় বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীর স্পর্শের যে কত উপরে তা দেখিয়ে তিনি বীরের মত মৃত্যুবরণ করলেন।

....মোকামাঘাট স্টেশনের প্লাটফর্ম—বাঙালীর তীর্থ—স্বাধীন ভারতের তীর্থভূমি।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও রেহাই পেলেন না। মাত্র চার মাস পর তিনি মরলেন বিপ্লবীদের গুলিতে।

(১৯শে মে, ১৯০৮—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) আর এক বিশ্বাসঘাতক আলিপুর বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই। আলিপুর জেলের হাসপাতালে এই বিশ্বাসঘাতককে রিভলবারের গুলিতে নিহত করেন চন্দননগরের কানাই দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন বসু। বিপ্লবী-দের ইতিহাসে এ এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর ঘটনা।

নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে আলিপুরের সেসন জজ মিঃ এফ, আর, রো-র এজলাসে কানাই ও সত্যেনের বিচার সুরু হ'ল। বিচারে দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হ'ল।

কানাইলাল! (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭—১০ই নভেম্বর ১৯০৮):

কংসের কারাগারে যে শুভদিনে শিশু শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী নিধনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন সেই পূত জন্মাষ্টমী দিনে ১৮৮৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন কানাইলাল দত্ত। কানাই-এর বাবা বোম্বাই শহরে এক আপিসে কাজ করতেন। কানাই-এর বাল্যজীবন বোম্বাইতে অতিবাহিত হয়। ১৯০৩ সনে কানাই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর সুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন। কানাই দত্ত ছিলেন খুব ভাল ছাত্র। আহারে-বিহারে, চাল-চলনে, তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। পরদুঃখকাতরতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। একুশ বছর বয়সের ছেলের কি অসীম সাহস। সেই বয়সে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গীতার মর্ম—আত্মা অবিনশ্বর।

ফাঁসির হুকুম শুনে তাঁর ভয় হয় নি—আনন্দে বৃদ্ধি পেয়েছিল

তাঁর দেহের ওজন। ফাঁসি মঞ্চে নিয়ে যাবার একটু আগে দেখা গেল অকাতরে ঘুমোচ্ছেন তিনি। হাসি মুখে তিনি গলায় পরলেন ফাঁসির রজ্জু। এই ত মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মৃত্যু।

সত্যেন্দ্রনাথ। (৩০শে জুলাই, ১৮৮২—২১শে নভেম্বর, ১৯০৮) ঃ

১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রাখী পূর্ণিমা তিথিতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। স্বাদেশিকতার প্রবর্তক রাজনারায়ণ বসুর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর স্বাস্থ্য বরাবর খারাপ ছিল কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন কর্মঠ কর্মী। ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চে তিনি স্বদেশমুক্তির কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।

কানাই-এর শব মিছিলএ জনসাধারণের উন্মত্ত উদ্দীপনা দেখে সরকার সত্যেনের শব কারাগারে দাহ করবার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার জনসাধারণ তাঁর কুশপুত্তলিকা নিয়ে মিছিল বার করতে উদ্যোগী হলেন। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে তাও বন্ধ করলেন।

আলিপুর বোমার মামলা। বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়ালেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ (সি. আর. দাশ)। শ্রীঅরবিন্দ প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের হ'ল ফাঁসির হুকুম। হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসির হুকুম রদ হ'ল। উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ দশজনার হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্যান্য বিপ্লবীরা পাঁচ থেকে দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বন্দীদের নিয়ে জাহাজ চলল আন্দামানে। স্বদেশ থেকে বহুদূরে নির্জন দ্বীপে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বঙ্গদেশের শ্রেষ্ট সন্তানরা অসীম নির্যাতন ভোগ করেন। জেলের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করেন এবং উল্লাসকর উন্মাদ হন।

আলিপুর বোমার মামলার বিচারের প্রতিবাদে এবং স্বদেশপ্রেমিক বীরদের উপর নির্যাতনের জবাবে বঙ্গদেশের বিপ্লবীদের হাতে গর্জে উঠে অগ্নিনালিকা—দাঁতের বদলে দাঁত। সন্ত্রাস আর প্রতিশোধ। ১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসের অপরাহ্ন। কলকাতার ওভারটুন হলের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করছেন পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারী লাট ফ্রেজার। বিপ্লবীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি রক্ষা পান। বিপ্লবী যতীন রায় ঘটনাস্থলেই ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১৯০৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী, বেলা দ্বিপ্রহর। কলকাতার সুবারবন পুলিশ কোর্ট থেকে বার হয়ে আসছেন "আলিপুর বোমার" মামলার

সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। চারু বসু নামক খুলনার একজন তরুণ যুবক সামনে এসে উপস্থিত হ'ন। তাঁর বা-হাতের কব্জিতে রিভলবার বাঁধা,—নুলো ডান হাতে তিনি টিপলেন তাঁর রিভলবারের ঘোড়া। উকিলবাবুর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। বোমার মামলার বিচারের প্রতিশোধ নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন নুলো চারু বসু।

১৯১০ সনের জানুয়ারি মাসের বেলা দ্বিপ্রহর। কলকাতার হাইকোর্ট। পুলিশের ডেপুটি সুপার সামশুল আলম হাইকোর্ট থেকে বার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন এমন সময় একজন তরুণ যুবক এসে সামনে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন আপনার নাম সামশুল আলম?

উত্তর হ'ল—হুঃ!

"এই নিন্ আপনার পুরস্কার।"

গর্জে উঠল আগন্তুকের হাতের রিভলবার। সিঁড়িতে গড়ায় সামশুল আলমের প্রাণহীন দেহ। আলিপুর বোমার মামলার সাক্ষী-সাবুদ যোগাড়ের ভার ছিল এঁর উপর। বিপ্লবীদল তার প্রতিশোধ নিলেন। আততায়ী বিপ্লবীর নাম বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত। বিচারে তাঁর হ'ল ফাঁসি। দেশের মাঠির ধূলায় ঝড়ল আর এক ফোঁটা তাজা খুন।

সামশুল হত্যার ষড়যন্ত্রে প্রায় পঞ্চাশজন লোক ধরা পড়লেন?

হাওড়া কোর্টে তাঁদের বিচার চলল ১৯১০ সনের মার্চ থেকে ১৯১১ সনের এপ্রিল পর্যন্ত। এই মামলার নাম "হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা।" আসামীদের মধ্যে প্রধান বাঘা যতীন। প্রমাণাভাবে তিনি হলেন বেকসুর খালাস। বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর বাঘা যতীন হলেন বিপ্লবীদলের কর্ণধার।

তিনি বঙ্গদেশ সরকারের সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তাঁর এ চাকুরি খতম হ'ল। তিনি আত্মগোপন করে বিপ্লব কার্যের নায়কত্ব করেন। বিপ্লব আবার দানা বাঁধে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সাহায্যে ভারত থেকে ইংরাজ বিতাড়নের যে সুপরিকল্পিত অভ্যুত্থানের ভারতময় ষড়যন্ত্র হয় তার মহানায়ক বাঘা যতীন। বঙ্গদেশের বাইরে বাঙালীর দেখাদেখি বিপ্লব সুরু হয়। মদনলাল ধিংরা পলিটিক্যাল এ-ডি-সি-কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জনকে হত্যা করে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন।

মাদ্রাজের তিনেভেল্লির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ত্রাসে ও নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন।

উত্তর ভারতের বিপ্লব সংগঠনের বাঙালীর নিষ্কাম অবদান ছিল। রাসবিহারী বসু, শৈলেন ঘোষ, বসন্ত বিশ্বাস, শচীন সান্যাল প্রভৃতি অনেকে ছিলেন এই সংগঠনের নায়ক।

১৯১২ সন। বঙ্গভঙ্গ তখন সবেমাত্র রদ হয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লীতে এসেছে রাজধানী। সমগ্র নগরী আলোকমালায় সুসজ্জিত। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে শোভাযাত্রার সাথে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন। হার্ডিঞ্জের উপর পড়ল বোমা। বড়লাটের কোন ক্ষতি হল না। মরল একজন আরদালি।

এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে লাহোর লরেনস্ গার্ডেনে আবার বোমা-ফাটে। এবারও একজন আরদালি মারা যায়। পুলিশ আবিষ্কার করল যে দেরাদুন ফরেষ্ট আপিসের বিশিষ্ট সহকারী রাসবিহারী বসুর এ সব কীর্তি। পুলিশ তাঁকে ধরতে পারল না। ধরা পড়লেন তাঁর সহকর্মী আমীর চাঁদ, অবোধবিহারী, বাল মুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস। সুরু হ'ল দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। সকলের হ'ল ফাঁসি।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট পোড়াগাছা গ্রামে বসন্তকুমার বিশ্বাসের জন্ম। দিল্লীর কোন এক বাড়ির ছাদ থেকে কিশোরী বালিকার ছদ্মবেশে তিনি হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ফেলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

আর মহানায়ক রাসবিহারী। ইংরাজ-বিরোধী জার্মান শক্তির সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য তিনি জাপানে পালিয়ে যান।

জার্মানীর সাথে ইংরাজের যুদ্ধ বাধল। এই সুযোগে বঙ্গদেশের ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদল ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র-বিপ্লবের আয়োজন করলেন। আর প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানের সহিত ষড়যন্ত্র রচনায় ব্রতী হলেন। ব্যাটাভিয়ায় জার্মানীর সহিত বিপ্লবী ভারতের সংযোগকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। ব্যাংককে বিপ্লবীদের প্রতিনিধি গেলেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যাটাভিয়ায় সি. মার্টিন এই গুপ্তনামে চললেন নরেন ভট্টাচার্য। পরে তিনি এম. এন. রায় নামে বিখ্যাত হন। অবনী মুখার্জি জাপানে রাসবিহারী বসুর সাথে মিলিত হলেন।

নানা সূত্রে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের কথা ইংরাজ শাসকরা জানতে পারে। অবনী মুখার্জী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করে ভারতে আসার পথে পথিমধ্যে গ্রেফ্‌তার হন। সিঙ্গাপুরে তাঁর ফাঁসি হয়

(১৯১৫)। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গোয়াতে ধরা পড়েন। পুণা জেলে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন। বাংলার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নায়ক বাঘা যতীনকে খোঁজ করে পুলিশ। বঙ্গদেশে তখন বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটছিল।

১৯১৩ সন। মৌলভীবাজারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডনকে মারতে গিয়ে একজন অজ্ঞাতনামা বিপ্লবী হাতের উপর বোমা ফাটায় মারা যান। ময়মনসিংহে মারা যান পুলিশের দারোগা বঙ্কিম চৌধুরী। মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলার উৎসাহী কর্মচারী আবদার রহমানকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীর বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা না ফাটায় তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।

আই, বি'র ডি, এস, পি যতীন্দ্রমোহন ঘোষ একটি ছোট শিশুকে কোলে করে দোর গড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। চার পাঁচজন লোক অকস্মাৎ তাঁকে আক্রমণ করেন। যতীন ঘোষ ইহধাম থেকে বিদায় নেন। সিরাজদীঘিতে গুপ্তচর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। আই-বি'র ইনস্‌পেকটর নৃপেন্দ্র ঘোষ ট্রাম থেকে অবতরণ কালে বিপ্লবীর গুলীতে নিহত হন। পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জীর উপর বোমা পড়ে কিন্তু মারা যায় একজন পুলিশ। কোন ক্ষেত্রেই আততায়ী ধৃত হন না।

১৯১৪ সনের সবচেয়ে রহস্যজনক ঘটনা রডা কোম্পানির পিস্তল লুট। ২৬শে আগষ্ট, ১৯১৪ সাল। রডা কোম্পানির বন্দুক, পিস্তলের দোকান। মাল খালাস করবার জন্য চললেন কোম্পানির শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামক একজন কর্মচারী। ভদ্রলোকটি সমস্ত মাল বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। এভাবে বিপ্লবীদের হাতে এল পঞ্চাশটি মশার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ হাজার কার্তুজ। বিপ্লব-কার্যে এই ভদ্রলোকের অবদান চিরস্মরণীয়। রডা কোং-এর পিস্তল লুট এবং ১৯১৫ সালের প্রারম্ভকালে বেলিয়াঘাটা ও গার্ডেনরিচের রোমাঞ্চকর দুটি ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিশ বাঘা যতীনের খোঁজ করে। বাঘা যতীনের সন্ধানে রত পুলিশ ইনস্‌পেকটর সুরেশচন্দ্র মুখার্জী হেদুয়ার মোড়ে চিত্তপ্রিয়ের গুলিতে নিহত হন।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের একটি বাড়িতে বড় বড় পুলিশ অফিসারদের আলোচনা সভা চলছিল। সহসা বাঘা যতীনের লোক তাঁদের উপর গুলি চালিয়ে পলাতক হন। একজন অফিসার নিহত হন এবং অনেকে

আহত হন। বাঘা যতীনের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে নীরদ হালদার নামক এক গুপ্তচর প্রবেশ করে (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫)। বাঘা যতীন তাঁকে নিহত করে সহকর্মী বিপ্লবীদের সাথে পলাতক হন। সহকর্মী চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিশচন্দ্র সহ বঙ্গদেশ ত্যাগ করে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বাঘা যতীন আশ্রয় নিলেন।

সামনে সারা ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট তারিখ। বিপ্লবীরা এক একজন এক একটি কাজের ভার নিয়ে এক এক দিকে অগ্রসর হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ নিলেন বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলপথ অচল করবার ভার। রায়মঙ্গলের কাছে জুনের মাঝামাঝি (১৯১৫) অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ 'ম্যাভারিক'-এর নোঙ্গর করার কথা। অস্ত্রশস্ত্র নামানর ব্যবস্থা করেছিলেন রায়মঙ্গল থেকে যাদুগোপাল মুখার্জি। সঙ্গীদের সহ যতীন্দ্রনাথ তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বরের দিকে রওনা হওয়ার কথা পুলিশ কোন সূত্রে টের পায়। সারা ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ২৩শে জুন। কিন্তু বিপ্লবীদলের জনৈক সদস্য কর্তার সিং তা ফাঁস করলেন। পুলিশ তৎপর হ'ল। বাঘা যতীনের সংবাদ পেয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ময়ূরভঞ্জ হয়ে বালেশ্বরের পথে অগ্রসর হন। বিপ্লবীগণ বালেশ্বরের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। ম্যাভারিক জাহাজ নানান গোলযোগে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে পারল না। আশায় আশায় দিন যায়। এদিকে খাবার ফুরিয়ে আসে। খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা খেয়ে সমুদ্রের দিকে তাঁরা চেয়ে থাকেন। কখন আসবে 'ম্যাভারিক' জাহাজ....কখন তারা হাতে পাবেন জাহাজভরা রিভলবার, ভাঙবেন মায়ের পায়ের বেড়ী।

সম্মুখে শূন্যদৃষ্টি। পিছনে সশস্ত্র টেগার্ট বাহিনীর পদধ্বনি। পরাধীন দেশ ও সমাজকে সেবা করবার এই ত' পুরস্কার।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের রক্তাক্ত ৯ই সেপ্টেম্বর। পঞ্চ বিপ্লবীর সম্মুখে ব্যর্থতা ও মৃত্যুর নির্মম ক্ষণ···হুকুম প্রতিধ্বনিত হয়ঃ Surrender.

বিপ্লবীদের আস্তানার সন্ধান দিয়েছে গ্রামের এক চৌকিদার।

আবার হুকুমঃ Surrender. সিপাইরা চালায় রাইফেল। গর্জে উঠে বিপ্লবীদের হাতের রিভলবার। পরিখার অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের দেখতে পায় না টেগার্টের সিপাইরা। তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ

হয়। কিন্তু বিপ্লবীদের লক্ষ্য অব্যর্থ। দলে দলে সিপাই প্রাণ দিল। সিপাইরা ছল করে পশ্চাদপসরণ করে। এ কৌশল ব্যর্থ হয় না। কৌতূহলী বিপ্লবীরা পশ্চাদসরণকারী সিপাইদের দেখবার জন্য পরিখা থেকে মাথা তোলে। অমনি সিপাইদের সন্ধানী গুলি এসে লাগে চিত্তপ্রিয়ের গায়। পরিখায় লুটিয়ে পড়ল চিত্তপ্রিয়ের প্রাণহীন দেহ। চিত্তপ্রিয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অন্যমনস্ক বাঘা যতীনের দেহে সিপাই-দের গুলি লাগে। আহত যতীন্দ্রনাথ। গুলি চালান বিপ্লবীরা। পশ্চাদপসরণ করে টেগার্টের সিপাইরা। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শ্রমে কাতর বিপ্লবীরা। পরিখায় লুটিয়ে পড়লেন আহত বাঘা যতীন। মৃত্যু বুঝি আসন্ন। বিপ্লবীরা উত্তরীয় তুলে সন্ধির প্রার্থনা জানায়।

১০ই সেপ্টেম্বর (১৯১৫) ভোর বেলায় বালেশ্বর হাসপাতালে বাঘা যতীন প্রাণত্যাগ করেন। নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। জ্যোতিষ পালের হল কালাপানি,—পরে উন্মাদ অবস্থায় পাগলা গারদে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মুক্তির দুর্বার কামনায় দেশপ্রেমিক বিপ্লবী পাগলের দল মৃত্যুর মাঝে হয়ত পেলেন শান্তি কিন্তু এ মরার মত মরণে পরাধীন ভারতের কপালে রক্ত তিলক পরিয়ে তাঁরা যে নূতন ইতিহাস রচনা করে গেলেন, তার মূল্য ত' দিতে পারবে না কেউ!

ভারতের বিপ্লববাদে ইংরেজের নারকীয় প্রতিহিংসা-জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)

জাগে গান্ধীজীর গণ-আন্দোলন-অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯)

বিপ্লব দমনে নতুন আইনের আশ্রয় নিল ইংরাজ সরকার। তৈরী করল রাওলাট বিল। বিনা বিচারে বন্দী করার অধিকার হাতে নিল সরকার। তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে ভারতীয় আইন সভায় ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে 'রাওলাট' বিল পাশ হল। বড়লাটের সম্মতি পেয়ে বিল

আইনে পরিণত হয়। গান্ধীজী অবিলম্বে এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু করলেন। তিনি সত্যাগ্রহ করবার সংকল্প নিলেন ৬ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে। সারা ভারতে ঘোষিত হল হরতাল।

পাঞ্জাবে জাগল দারুণ গণ-বিক্ষোভ। পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেফ্‌তার উপলক্ষ করে জাগল গণ-বিক্ষোভ। বিক্ষুব্ধ জনতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। পাঁচজন ইংরাজ প্রাণ হারায়। পাঞ্জাবে চলল শাসকদের নারকীয় অত্যাচার। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯। সংক্রান্তির দিন রামনবমীর মেলা। রামনবমী উৎসব উপলক্ষে সাধারণ একটি সভা বসেছে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক মাঠে। সরু গলির পর এই মাঠের একটিমাত্র প্রবেশ-পথ।

পাঞ্জাবের সামরিক কর্তা তখন মাইকেল ও ডায়ার। পাঁচজন ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধবহ্নি তাঁর বুকের রক্তে নাচছে তখন। সেই উন্মাদনায় ও ডায়ার রামনবমীর সভাকে রাজনৈতিক সভা ঘোষণা করলেন। পঞ্চাশজন গোরা সৈন্য আর একশ'জন দেশী সিপাই নিয়ে ছুটলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ মাঠে সেনানায়ক ও ডায়ার। নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার উপর গুলি চলল। এক আধটা গুলি নয়—ষোলশ' গুলি। এগার শ' লোক মরল। হতাহতদের মধ্যে ছিল বহু শিশু-নারী-বৃদ্ধ। পাঞ্জাবের উপর দিয়ে চলল নির্মম পাশবিক অত্যাচার। সামরিক আইন জারি হল। শহরে জল-আলো বন্ধ হল। অনেক লোক নির্বাসিত হ'ল। গুলির মুখে বহু লোক নিহত হ'ল। বন্দী লোকদের জোর করে রাজপথের উপর বুকে হাঁটান হ'ল।

খাঁচার মত ছোট ছোট ঘরে বন্দীদের আটক রাখা হয়। সদর রাস্তার উপর বেত্রাঘাত সুরু হ'ল। কালা-আদমির হাতে ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধে উন্মত্ত শাসকদল। সমগ্র পাঞ্জাব যেন অবরুদ্ধ, শব-কবলিত প্রদেশ। সর্বশ্রেণীর ইংরাজরা ডায়ারের এ পন্থা সোল্লাসে সমর্থন করলেন। শুধু একজন ইংরাজ-পাদরি ও মহামতি এণ্ডরুজ প্রতিবাদ জানালেন। এণ্ডরুজকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ল না। সাগর পার থেকে, এদেশ থেকে ইংরাজরা ঘাতক ডায়ারকে উৎসাহ দেয়। ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়া ডায়ারকে তারা উপহার দিল। তাঁর সম্মানে বসল ভোজসভা। বিলাতের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধররা, সাংবাদিকরা পর্যন্ত ডায়ারের পক্ষে ওকালতি করেন। ইংরাজজাতির কি দারুণ প্রতিহিংসা,

কি দারুণ বর্ণবিদ্বেষ।

মহাত্মা গান্ধী অহিংস পন্থায় মুক্তির লড়াই ঘোষণা করেন। পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে জাগে আন্দোলন। অত্যাচারের প্রতিবাদ প্রথমে জাগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। তিনি সরকারের দেওয়া "স্যার" উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটের কাছে পত্র দিলেন। আর একজন লোক সেদিন রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি স্যার শঙ্করণ নায়ার। তিনি বড়লাট সভার সদস্য পদ ত্যাগ করলেন।

গান্ধীজীর সাথে সরকারের রফা হ'ল। তিনি আপাততঃ সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখতে রাজী হলেন। সরকারও পাঞ্জাবের বুক থেকে সামরিক আইন তুলে নিল। বন্দীদের মুক্তি দিল।

অমৃতসরে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। ভারতবাসী এখানে প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে পেয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে ষোলশ' রাউন্ড গুলি। গান্ধীজী আরও কিছুদিন ইংরাজের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে ইচ্ছুক হলেন। ১৯২০ সন। কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশনে সরকারের সাথে সকলপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করবার ও অসহযোগ আন্দোলন সুরু করবার সঙ্কল্প নেওয়া হ'ল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অন্য কোন আন্দোলন সুরু করবার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন এবং কাজ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। ১৯২১ সনে নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে এসেই তিনি বঙ্গদেশে প্রথম সুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই প্রথম সুরু হয়।

চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল। একদিন তিনি সমস্ত বিলাস-বাসন ত্যাগ করে দেশের জন্য হলেন সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বঞ্চিত, মথিত দেশের নীরব ক্ষোভের তিনি ভাষ্য দিলেন। চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। স্কুল, কলেজ ছেড়ে দলে দলে বাঙালী ছেলেরা বার হ'ল,—নামল দেশের কাজে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হ'ল। সরকার বে-আইনী ঘোষণা করল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন। ইংরাজের কারাগারে বন্দী হল বিশ হাজার বাঙালী সন্তান।

১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাস। চিত্তরঞ্জনের পত্নী ও ভগিনী বড় বাজারে খদ্দর বিক্রী করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল।

দিকে দিকে চলে আন্দোলনের ঢেউ। জাগ্রত বঙ্গদেশের নেতা চিত্তরঞ্জনকে ভারত সরকার বন্দী করল।

ইংলণ্ডের যুবরাজ আসলেন বিলাত থেকে এদেশে। সর্বত্র হরতাল হল। ১৯২২ সন, পয়লা ফেব্রুয়ারি। বড়লাট রিডিং-এর নিকট পত্র দিলেন মহাত্মাজী।

—সাত দিনের মধ্যে ভারতের অবহেলিত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইংরাজের মনোভাবের পরিবর্তনের আভাস না পেলে তিনি বারদোলিতে সুরু করবেন পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলন। কৃষকরা এগিয়ে এল। ভারত বিদ্রোহ ঘোষণা করল। উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরায় কংগ্রেসের এক শোভাযাত্রায় থানার পুলিশ বাধা দেয়। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়—আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল থানা। একুশজন কনষ্টেবল সহ একজন দারোগা মারা গেল।

অসহযোগ আন্দোলন হিংস্ররূপ নেওয়াতে গান্ধীজী বন্ধ করে দিলেন আন্দোলন। পরের মাসে আপত্তিকর লেখার জন্য গান্ধীজীর জেল হ'ল ছ'বছর। এর ক'মাস পর চিত্তরঞ্জন মুক্তি পেলেন। আন্দোলন তখন স্তব্ধ। সেদিন চিত্তরঞ্জন একজন কবি মাত্র।

অসহযোগ আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন সেদিন প্রকাশ্যভাবে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। সেই ইতিহাসই চিত্তরঞ্জনের শেষ ইতিহাস। ১৯২০ সাল। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব তুললেন এবং দেশবন্ধু আইন পরিষদের ভিতর দিয়ে সংগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এল অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ! চিত্তরঞ্জন মতানৈক্য সত্বেও বিশ্বস্ত সৈনিকের মত কংগ্রেসের আদর্শ মেনে নিলেন। তিনি শামলা ছেড়ে খদ্দর ধরলেন, আদালত ছেড়ে বক্তৃতা মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। বঙ্গদেশও তাঁর প্রিয়তম নেতার অনুগামী হ'ল।

১৯২১ সন। স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলেরা বার হয়ে এলো। সরকারী কার্যালয় থেকে উকিল, কেরানী, কর্মচারীরা বার হ'ল। বিদেশী শাসকের নির্যাতন সুরু হ'ল। চিত্তরঞ্জন জেলে গেলেন।

বারদোলেতে কংগ্রেসের সভা বসল। সেই সভায় গান্ধীজী বন্ধ করে দিলেন চৌরীচৌরা আন্দোলন। কারাগারে নেতারা ক্ষুব্ধ হ'লেন। কিন্তু গান্ধীজীর সংকল্প অটল। পরের মাসে কয়েকটা আপত্তিকর লেখার জন্য গান্ধীজীর ছ'বছর জেল হ'ল। এদিকে ২২শে জুলাই তারিখে চিত্তরঞ্জন মুক্তি পেলেন। কংগ্রেসের তখন কোন আন্দোলন নেই। ঐ সনেই গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি রূপে চিত্তরঞ্জন আইন পরিষদের ভিতরে থেকে সংগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। এবার সে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না। পরের বছর কংগ্রেস অধিবেশনে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২৩ সন। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে "স্বরাজ্য দল" গঠিত হ'ল। বঙ্গদেশের আইন-পরিষদে "স্বরাজ্য দল" একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হ'ল। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করতে রাজী হলেন না। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে তাঁর দল মন্ত্রিদের বেতন পাশ করল না। আইন পরিষদের লড়াইতে দেশের লোকের জয় হল।

১৯২৪ সন। 'স্বরাজ্য দল' করপোরেশন অধিকার করল। পর পর দুবছর চিত্তরঞ্জন মেয়র নির্বাচিত হলেন। এসময়ে তিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়ী হন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ তাঁর এক বিরাট কীর্তি।

এই বছরেই হঠাৎ একদিন কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে গোপীনাথ সাহা নামে একজন তরুণ বিপ্লবী স্যার চার্লস টেগার্টকে মারতে গিয়ে মারলেন আর্নেষ্ট ডে-কে। বিচারে গোপীনাথের ফাঁস হয়। সরকার বিপ্লবীবাদের গন্ধ পেয়ে অর্ডিনান্স পাশ করে বিপ্লববাদীদের বিনা বিচারে আটক করতে লাগলেন। এই অর্ডিনান্স ১৯২৫ সনে 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট' নামে আইনে পরিণত হয়।

চিত্তরঞ্জন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করলেন। এই আইনের নাম দেন 'বে-আইনী আইন' (Lawless Law)। এই কর্ম জীবনের মাঝে সর্বস্বত্যাগের আহ্বান তাঁর মনকে ক্রমশঃ নাড়া দিচ্ছিল। তাঁর কবি অন্তর, বৈষ্ণব মন তাঁকে নিঃশেষে আত্মদান করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব....মায় বসতবাটি পর্যন্ত মেয়েদের হাসপাতাল আর সেবাব্রত শিক্ষার জন্য দান করে গেলেন। তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গড়া "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" তাঁর কীর্তির পূত

নিদর্শন। এই আত্মত্যাগের জন্য দেশবাসী তাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করেন।

এরপর তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সূত্র প্রকাশ করেন। শ্রমিক আন্দোলনেও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দু-দুবার তিনি বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তাঁর স্বরাজ ছিল সাধারণের স্বরাজ। মুষ্টিমেয় দু'চারজন বড়লোকের হাতে রাষ্ট্র-শক্তি এলেই যে তাকে স্বরাজ্ বলা চলতে পারে না—এই ছিল তাঁর বাণী।

আইন অমান্য আন্দোলন

চৌরীচৌরার পর সুর হয় সারা-ভারতব্যাপী নূতন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি। এতে ছিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্য সেন (মাষ্টারদা)-এর কুশলী সংগঠন ও গোপন নায়কত্ব। এই প্রস্তুতির প্রধান উদ্দোক্তা কলকাতার কর্মী সন্তোষ মিত্র। ইনি ছিলেন শাঁকারিটোলা ও উল্টোডিঙি পোষ্টাফিসের টাকা লুটের নায়ক। তিনি রাজবন্দীরূপে হিজলী জেলে থাকাকালে (১৯৩২) রক্ষী-সৈন্যের গুলিতে নিহত হন।

বঙ্গদেশে তখন দুটি বিপ্লবী দল—যুগান্তর ও অনুশীলন দল। সূর্য সেনের দল 'যুগান্তর' দলের অন্তর্ভুক্ত। এই সময় "যুগান্তর" ও "অনুশীলন" দল মিলিতভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রয়াসী হন। একযোগে বঙ্গদেশের দশটি ব্রিটিশ শক্তির-কেন্দ্র অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারী অর্থ অধিকার ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনা।

সূর্য সেন চট্টগ্রাম এলাকা ছেড়ে আসামে পদার্পণ করলেন। আসামের চা বাগানে হ'ল তাঁর গুপ্তবাস। এই গুপ্তবাসে তাঁর সঙ্গী ছিলেন চট্টগ্রামের রাজেন দাস আর খুলনার রতিকান্ত। এই সঙ্গীদের সহায়তায় সূর্য সেন আসামের নানাস্থানে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে তাঁর ও অন্যান্য বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল আসাম ও বঙ্গদেশের

দশটি জেলার অস্ত্রাগার আক্রমণ ও ইংরাজের শক্তিকেন্দ্র অধিকার। এই কার্যে বঙ্গদেশের বাইরের নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আসামের চা বাগান ছেড়ে সূর্য সেন কলিকাতায় এলেন।

১৯২৪—২৫ সালের কথা। কলকাতায় শোভাবাজারে তখন সূর্য সেনের গুপ্তাবাস। সুরু হয় বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের বাইরে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার জন্য লোক, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের আয়োজন।

১৯২৫ সনের ৯ই আগষ্ঠ রাত্রি। ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন যুক্ত প্রদেশের কাকোরী স্টেশন ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, সহসা মাঝপথে গাড়ী থেমে গেল। রিভলবারধারী একদল তরুণ যুবক গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। রিভলবারের ফাঁকা গুলি চলে অনবরত। আতঙ্কিত হয় যাত্রী আর রেলের কর্মচারীরা। সোরগোলের মধ্যে যুবকরা মেলভ্যানের টাকার থলি নিয়ে সরে পড়ল অন্ধকারের ভিতর।

স্বদেশী ডাকাতি। ধরপাকড় সুরু হয়। যুক্তপ্রদেশের তরুণ দেশকর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ধরা পড়লেন কজন প্রবাসী বাঙালী যুবক। কাশীর একজন বাঙালী যুবক—সুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত ও সাহিত্যিক এ ডাকাতির অন্যতম নায়ক ছিলেন। তাঁর নাম রাজেন লাহিড়ী। পুলিশ তাঁকে কাশীর বাড়ীতে পায় না। তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীতে একটি বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। কয়েকজন বিপ্লবীসহ তিনি বোমা নির্মাণে ব্যস্ত।

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কোন এক সূত্রে এই কারখানার সন্ধান পায়। ১৯২৫ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে পুলিশ এই কারখানা বাড়ি ঘেরাও করে।

প্রবাসী বাঙালী বিপ্লবী শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে বঙ্গদেশের বাইরে বিরাট বিপ্লবায়োজন করেন এই রাজেন লাহিড়ী।

কলকাতায় শোভাবাজারের গুপ্তাবাসে বসে সূর্য সেন এঁদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। শচীন সান্যাল প্রমুখ নেতাদের এখানে যাতায়াত ছিল। পুলিশ এতদিন এই আস্তানার সন্ধান পায়নি। কাকোরি ট্রেন ডাকাতি এবং দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হবার পর পুলিশ শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান পায়।

বস্তুতঃ সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অর্থের জন্য সংগঠিত হয় কাকোরি ট্রেন ডাকাতি এবং অস্ত্রের জন্য স্থাপিত হয় দক্ষিণেশ্বরে

বোমার কারখানা। নীরব কর্মী সূর্য সেন ছিলেন এর অন্যতম নেতা।

দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানার প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও রাখাল দে সূর্য সেনের দলের লোক। প্রমোদরঞ্জন সিটি কলেজের ছাত্র। এঁরা দুজনে থাকতেন সূর্য সেনের সাথে শোভাবাজারের আস্তানায়।

১৯২৫ সনের শেষাশেষি পুলিশ শোভাবাজারের আস্তানার সন্ধান পায়। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। পুলিশ শোভাবাজারের অস্তানায় হানা দিল। শোভাবাজার। দোতলার একখানি ঘর—রুদ্ধ। ভিতরে বিপ্লবী সঙ্গীসহ সূর্য সেন। শেষ রাত্রি। আসন্ন প্রভাত। সহসা বাইরে পুলিশের বুটের শব্দ। রুদ্ধ দুয়ারে পুলিশের করাঘাত। সদ্য নিদ্রোত্থিত বিপ্লবীগণ শয্যাত্যাগ করেন। প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী সূর্য সেনের অন্যতম সঙ্গী। তিনি ক্ষিপ্র-গতিতে সূর্য সেনকে বাথরুমের ভিতরে নিয়ে যান। বাথরুমের জানালা ভেঙ্গে সূর্য সেনকে জলের পাইপের উপর নামিয়ে দিয়ে প্রমোদরঞ্জন ছুটে যান রুদ্ধ দুয়ারের গায়। নিজের সমস্ত দেহ দিয়ে তিনি দুয়ার আগলে থাকেন। ইতিমধ্যে সূর্য সেন জলের পাইপ ধরে নেমে কলকাতার জনসমুদ্রে মিশে যান।

প্রমোদরঞ্জন পুলিশের হস্তে বন্দী হন। দক্ষিণেশ্বরে বোমার মামলার আসামী হিসাবে তাঁকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠান হয়। এই সময় এই জেলে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে।

আই-বি পুলিশের সুপারিণ্টেডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দীদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। প্রমোদরঞ্জন কারাসঙ্গী অনন্তহরি মিত্রের সাথে তাঁকে ঘটনাস্থলে নিহত করেন। হত্যা অপরাধে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের বিচার হয়। তাঁরা মাথা পেতে নিলেন ফাঁসির আশীষ। বঙ্গদেশের বাইরে যুক্ত প্রদেশের আদালতে রাজেন লাহিড়ীর বিচার চলল। বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

আমাদের শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা বিচার করবার জন্য জনমত পদদলিত করে এল সাইমন কমিশন। সে অপমানের জবাব দেবার জন্য বিক্ষুব্ধ জনতা কালো পতাকা নিয়ে আওয়াজ তোলে—সাইমন, ফিরে যাও। বারদৌলি, মেদিনীপুর, বন্দাবিলায় কৃষকরা কর বন্ধ করল—কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে। কলকাতার কংগ্রেস (১৯২৮) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উঠে। কর্মচঞ্চল বিপ্লবীদল যখন ১৯২৪-২৫ সনের সর্বভারতীয় বিপ্লববাদ

রচনায় ব্রতী তখন একদল কর্মী শ্রমিক-আন্দোলন সুরু করে। রাশিয়ার সাম্যবাদীদের সাথে এ দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

১৯২৯ সনের প্রারম্ভে বত্রিশজন ভারতীয় শ্রমিক-নেতা ধৃত হন।

প্রায় পৌনে চার বৎসর ব্যাপী বিচারের পর তাঁরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এ দলে ছিলেন মজঃফর আমেদসহ কয়েকজন বাঙালী।

পাঞ্জাবে সাইমন বিরোধী বিক্ষোভে ছোট পুলিশ সাহেব 'স্যাণ্ডার্সে'র লাঠির আঘাতে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু ঘটে। পাঞ্জাব নিল তার প্রতিশোধ। বিপ্লবীর অগ্নিনালিকার সামনে স্যাণ্ডার্সকে জীবন দিতে হ'ল। এসেম্বলীতে বোমা পড়ল।

পাঞ্জাবের এই বৈপ্লবিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আমাদের বঙ্গদেশের একজন তরুণ—নাম যতীন দাস। লাহোর সেন্ট্রাল জেলের অনাচারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবীতে বাষট্টি দিন অনশনে কারাগারে এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আত্মদান করলেন ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর।

যতীন দাসের আত্মদানে বাঙ্গালীর সুপ্ত অন্তরে এল পূর্ণ-স্বাধীনতার ডাক। পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীর পথে এল ভারত। ভারতের সকল দলের নেতাদের সম্মেলনে নেতারা সিদ্ধান্ত করলেন,—তাঁদের মিলিত দাবী অনুযায়ী দিতে হবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। এ দাবী রচনা করবার ভার পড়ল এলাহাবাদের বিখ্যাত উকিল মতিলাল নেহেরুর উপর। মতিলাল নেহেরু জওহরলালের পিতা। তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন তার নাম "নেহেরু রিপোর্ট"। এই রিপোর্টে দাবী করা হ'ল—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন।

কলকাতায় বসল কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২৮। সভাপতি মতিলাল নেহেরু। নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করলেন তরুণদের পক্ষে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। এঁরা অবিলম্বে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন। গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় প্রবীণ ও তরুণদের মধ্যে মীমাংসা হ'ল। তাঁর প্রস্তাবে স্থির হ'ল ১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইংরাজ শাসক যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে সম্মত না হয় তবে ভারতের একমাত্র দাবী পূর্ণ-স্বাধীনতা।

১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর আসন্ন।

লাহোর কংগ্রেস। সভাপতি তরুণ জওহর। গান্ধীজী তীব্রকণ্ঠে

ঘোষণা করলেন, '৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পর পূর্ণ-স্বাধীনতার একতিলও কম আমরা নেব না। স্বাধীনতা আদায় করবার জন্য আমরা আইন-পরিষদ বর্জন করব—আর ইংরাজের আইন করব অমান্য।

৩১শে ডিসেম্বর পার হ'ল। ইংরাজ নীরব। সেদিন মধ্যরাত্রির পর ভারতের দাবী হ'ল পূর্ণ-স্বাধীনতা। শত মানবের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল —মুক্তি চাই।

গান্ধীজীর নির্দেশে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০) সমস্ত ভারত 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করল। পুলিশের বেড়াজালের মধ্যেও পার্কে পার্কে, ছাদে ছাদে উঠল তে-রঙা জাতীয় পতাকা। রাজপথে ধ্বনিত হ'ল "বন্দে মাতরম্"।

মুক্তিকামী ভারতের সহজ, সরল কণ্ঠে ধ্বনিত হল—মুক্তি চাই।

১৯৩০ সনের ১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ছটায় সুরু হ'ল গান্ধীজীর সত্য, প্রেম, অহিংসা ও মুক্তির অভিযান। বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গের মতন তিনি সত্যের সন্ধান দিলেন।

দাণ্ডীর পথে চলে গান্ধীজীর অভিযান। মরা দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে জাগে কর্মচঞ্চলতা। ৫ই এপ্রিল মহাত্মাজীর দল পেঁছাল দাণ্ডিতে। পরদিন সকাল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সারা ভারতে পালিত হল সেবার 'জাতীয় সপ্তাহ'। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের স্মৃতি অমর রাখবার জন্য এই 'জাতীয় সপ্তাহ' পালন করা হয়। এই জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস ৬ই এপ্রিল। এদিন সকাল সাড়ে আটটায় মহাত্মাজী দাণ্ডীর সমুদ্রোপকুলে লবণ-আইন অমান্য করলেন। হাজার হাজার লোক এ দৃশ্য দেখল। লক্ষলক্ষ ঘরে কোটি কোটি প্রাণে গিয়ে পেঁছাল নূতন বাণী মুক্তি চাই।

ভারতের সমুদ্রের লোনা জলে অজস্র লবণ অথচ ইংরাজের আইনের বিধানে ভারতবাসীদের পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয় সাত সমুদ্র তেরনদী পারের লিভারপুলের লবণ। অহিংস সত্যাগ্রহীর দল বালুচরে জ্বাল দেয় লোনা জল,—শাসকের তা সহ্য হয় না। সুরু হয় নিপীড়ন। সুরু হল লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন। একে একে অন্যান্য আইনের উপর হাত পড়ে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন মদের দোকানে পিকেটিং, কর-বন্ধ আন্দোলনও সুরু হয় এক এক জায়গায়। নেতারা বন্দী হলেন। ভারতের কারাগার বন্দীতে ভরে গেল।

বঙ্গদেশের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বঙ্গদেশে দুটি পৃথক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বিপ্লবীদল 'অনুশীলন সমিতি' যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে গ্রহণ করল। আর 'যুগান্তর' দল নিল সুভাষচন্দ্রের নায়কত্ব। বঙ্গদেশের তরুণরা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হ'ল। দলে দলে চলল সমুদ্রতীরে—কাঁথি, নীলা, মহিষাদল, ডায়মণ্ডহারবারে লবণ তৈয়ারী কেন্দ্রে। অনতিদূরেই সশস্ত্র পুলিশের শিবির। বঙ্গদেশের নির্ভীক তরুণরা বালুতীরে জ্বাল দেয় লবণ। ছুটে আসে শান্তিরক্ষক পুলিশ—গর্জে ওঠে আগ্নেয়াস্ত্র। কত তরুণ প্রাণ ঝরে পড়ে বালুচরে। মেয়েরা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করল পুলিশের হাতে। নীলাতে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন সদলে সুভাষচন্দ্র। নীলা হল ভারতের তীর্থস্থান।

বঙ্গদেশের ছাত্রদল ছাড়ল স্কুল, কলেজ। রাজপথে তারা সুরু করে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। তাদের হাতে চুরমার হয় মদের বোতল। আইনের পর আইন ভাঙে বঙ্গদেশের যুবশক্তি। যশোহরের নেতা বিজয় রায়ের নেতৃত্বে ও মেদিনীপুরের নেতা বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে বন্দীবিলা আর কাঁথিতে কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশ সেদিন ইংরেজের শাসন ধূলোয় লুটিয়ে দিল।

বাঙালী গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের শিক্ষা গ্রহণ করেনি। 'হিংসা' মন্ত্রের ভক্ত ছিল বাঙালী। তবুও এই বঙ্গদেশের মাটিতে গান্ধীজীর প্রবর্তিত আইন-অমান্য আন্দোলন সার্থকতা লাভ করল। এই বঙ্গদেশে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের জন্য ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম তরুণ প্রাণ বলি হল। সত্যাগ্রহে ভারতর প্রথম শহীদ আশু দলুই।

১৯৩০ সনের ২৫শে এপ্রিল নীলায় (চব্বিশ পরগণায়) লবণ আইন অমান্য করতে গিয়ে আশু দলুই পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

বঙ্গদেশের মেয়ে পৃথিবীখ্যাতা সরোজিনী নাইডু ইংরাজের কারা-গারের ভয় দূর করলেন কাব্যে আর সঙ্গীতে।

বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন চলেছে একটানা। বিপ্লববাদের মন্ত্রে বঙ্গদেশ উন্মুখ। সত্যাগ্রহের শিক্ষা—নিঃশেষে আত্মদান, অকুণ্ঠিত কষ্ট-স্বীকার আর অটুট দেশপ্রেম। বঙ্গদেশ সত্যাগ্রহের সব শিক্ষাই গ্রহণ করল। পাঁচ মাস আন্দোলন চলল। বিখ্যাত রাজনৈতিক সাপ্রু ও জয়াকর কংগ্রেসের সাথে শাসকের একটা মিটমাট করবার চেষ্টা করতে

লাগলেন। সরকার কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন রদ করার জন্য
অনুরোধ জানাল। কংগ্রেস রাজী হল না।

বিলাতে ১২ই নভেম্বর (১৯৩০) গোলটেবিল বৈঠক বসল। এ
বৈঠকের উপর ভারতের কোন আস্থা ছিল না। তারা সেদিন হরতাল
পালন করল। বৈঠকেও বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল না।

সাপ্রুর অনুরোধে সরকার ১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে
নেতাদের মুক্তি দিল। মার্চ মাসের পাঁচ তারিখে মহাত্মা গান্ধী ও
বড়লাট আরউইনের সাথে চুক্তি হয়। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ
হল। গান্ধীজী চললেন বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে। তখনও
অত্যাচার চলছে বঙ্গদেশে ও সীমান্তে।

অত্যাচারিত বঙ্গদেশ হল বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট।

বঙ্গদেশের নেতা সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে। বঙ্গদেশের কারাগারে
বঙ্গের তরুণ কর্মীদল। বঙ্গদেশের বুকের উপর দিয়ে চলেছে আইন
আর লাঠির অত্যাচার।

গোল টেবিল বৈঠকের ছলনায় বিভ্রান্ত ভারত। আপোষের পথে
গান্ধীজী।

শ্রান্তিহীন বঙ্গদেশের বিপ্লববাদ (১৯৩০-১৯৩৭)

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রিল। আয়ারের স্মরণীয় ইষ্টার দিবস।
রাত্রি পৌণে দশটা। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের অন্তরালে
চট্টগ্রামে বিপ্লবী সূর্য সেনের নায়কত্বে সুরু হয় চট্টগ্রামে এক সশস্ত্র
অভ্যুত্থান। নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ পুলিশ
লাইন আক্রমণের ভার ছিল অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের উপর। উচ্চতর
সামরিক কর্মচারীর পোশাকে গণেশ ঘোষ নিজ বাসা থেকে মোটরে বার
হলেন। মোটরের চালক অনন্ত সিংহ। সঙ্গে চললেন হিমাংশু সেন,

হরিপদ মহাজন আর বিনোদ দত্ত।

পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার আক্রমণের ভার ছিল লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের উপর। লোকনাথ বলের বাসা থেকে মোটরে বার হলেন তাঁরা। মোটরের চালক জীবন ঘোষাল। সঙ্গে চললেন রজত সেন, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী। টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস আক্রমণের ভার ছিল অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর। ঠিক একই সময় তিনি কংগ্রেস অফিস থেকে মোটরে বার হলেন। মোটরের চালক আনন্দ গুপ্ত।

রেলপথ বিকল করবার ভার ছিল উপেন ভট্টাচার্যের উপর। তিনি ঠিক ঐ সময়ে স্বকার্য সাধনের জন্য যাত্রা করেন। আরও ত্রিশজন বিপ্লবী এ সময়ে বার হলেন। তাঁদের কাজ—সাক্ষাতের অপেক্ষায় সরকারী অস্ত্রাগারের কাছে অবস্হান। সর্বশেষে এ সময় রক্ষীদল সহ মোটরে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন বার হলেন। সঙ্গে সরোজ গুহ, মহেন্দ্র চৌধুরী ও বিধু ভট্টাচার্য। তাঁরা চললেন সরকারী অস্ত্রাগারের দিকে।

রাজপথ—উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। পাশাপাশি ছোট ছোট দু'টো পাহাড়। একটার উপর পুলিশ ব্যারাক, অপরটির উপর সরকারী অস্ত্রাগার। এখানে এসে মিলিত হলেন সঙ্গীদল সহ গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং, আর রক্ষীদল সহ সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন। অরক্ষিত সরকারী অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের অতর্কিত আক্রমণে অধিকৃত হ'ল। ইহা এখন সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার। সর্বত্র বিপ্লবীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। উপেন ভট্টাচার্য রেলপথ বিকল করলেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী টেলিফোন-টেলিগ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে হেডকোয়ার্টারে উপনীত হলেন। পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার অধিকার করলেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। রজত সেনের গুলিতে ইংরাজ অফিসার সার্জেন্ট ফেরলে নিহত হয় এবং প্রহরীরা ও ইংরাজ অফিসাররা পলায়ন করে। ইংরাজ অফিসাররা সপরিবারে কর্ণফুলির জলে ষ্টীমারে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ সদলবলে সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার সরকারী অস্ত্রাগারে উপনীত হলেন। সরকারী অস্ত্রাগারে তখন ইউনিয়ন জ্যাকের স্হানে উড়ছে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসেন হিমাংশু সেন।

ম্যাগাজিনে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিতে গিয়ে তাঁর পায়ে লেগেছে আগুন। হিমাংশু সেন দাঁড়াতে পারেন না। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যান। অনন্ত সিং ছুটে এসে হিমাংশুকে কোলে করে মোটরে তুলে নিলেন। গণেশ ঘোষ আর জীবন ওরফে মাখন ঘোষাল মোটরে উঠলেন। শহরের দিকে ছুটল মোটর।

নির্বাক নিস্তব্ধ সূর্য সেন। অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় তিনি কাটালেন দু'ঘণ্টা কিন্তু ফিরলেন না তাঁরা। যোগ্য কর্মীর অবর্তমানে নূতন প্রোগ্রামে হাত দেওয়া অসম্ভব। আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সূর্য সেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদল উঠলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। ২২শে এপ্রিল। বিপ্লবীদল জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। অনাহারে, পিপাসায় বিপ্লবীদের দিন কাটে। আসন্ন সন্ধ্যা। পাহাড় ঘেরাও করে বৃটিশ ফৌজ—একদিকে ইষ্টার্ণ রাইফেল বাহিনী, অন্যদিকে সুর্ম্যাভ্যালি বাহিনী। দু'ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যেরা পরাজিত হয়। ইংরাজদের আড়াইশ' সৈন্য মারা যায় আর বিপ্লবীদের বার।.........

শহরে তিন দিন পরে হিমাংশুর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন (মাখন) ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত চট্টগ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। ফেণী স্টেশনে তাঁদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশকে সংগ্রামে পরাজিত করে তাঁরা কলকাতায় পেঁছাতে সক্ষম হন।

কোয়েপাড়ায় বিনয় সেনের গৃহে পলাতক জীবন যাপন করছেন সূর্য সেন। এখানে নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রভৃতি বিপ্লবীরা মিলিত হয়েছেন। তাঁদের সহযোগে সূর্য সেন তখন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করছেন। ফিরিঙ্গী বাজারের গৃহত্যাগী বিপ্লবী রজত সেনের নেতৃত্বে একদল তরুণের উপর এই সময় ইউরোপীয়ান ক্লাব অভিযানের নির্দেশ আসে। ৫ই মে, ১৯৩০ সন। রজত সেনের নেতৃত্বে একদল কিশোর চললেন ইংরাজ নিধনে ইউরোপীয়ান ক্লাবের অভিমুখে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যে অসুবিধা হওয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন তাঁরা। ফেরবার পথে বন্ধুদের সাথে নিয়ে বাড়িতে একবার মার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। খেতে বসেছেন সকলে, এমন সময় গ্রামের লোকের খবরে পুলিশ এসে পড়ল। তারা পালালেন

শ্যাম্পানে নদী পথে।

স্টীমবোটে পুলিশ অনুসরণ করে। শ্যাম্পান থেকে বিপ্লবীরা তীরে নেমে পড়েন কালারপোলের কাছে শন বনে। একজন মুসলমান ছেলে পুলিশে খবর দেয়। ডি. আই. জি ফার্মারের নেতৃত্বাধীনে একদল সশস্ত্র সৈন্যের সাথে কিশোর বিপ্লবীদের যুদ্ধ হয় পরদিন ৬ই মে ১৯৩০। সম্মুখ সমরে প্রাণ দেন রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়। জালালাবাদের মত কালারপোলের এ যুদ্ধ ইতিহাসে স্বরণীয়।

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও আনন্দ গুপ্ত কলকাতায় পৌঁচেছেন তখন। কলিকাতার যুগান্তর দলের ব্যবস্থাপনায় তাঁরা আশ্রয় পেয়েছেন চন্দননগরে গোঁদলপাড়ায় শশধর চক্রবর্তী নামক একজন বিপ্লবীর (খুলনার লোক) ঘরে। সুহাসিনী নাম্নী এক বিপ্লবিনী মহিলা শশধরের স্ত্রী সেজে ঘরকন্না করতেন। সূর্য সেনের নির্দেশে লোকনাথ বল কলিকাতার বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কলিকাতায় যাত্রা করলেন এবং গোঁদলপাড়ায় গুপ্ত আস্তানায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হলেন। এদিকে জালালাবাদ যুদ্ধে আহত জ্ঞানহীন অম্বিকা চক্রবর্তী জ্ঞানলাভের পর পাহাড় থেকে অবতরণ করেন এবং ফতেয়াবাদ গ্রামে গুপ্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন।

২৮শে জুন, ১৯৩০। হঠাৎ একদিন ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা। গোঁদলপাড়ার গুপ্ত আশ্রয় থেকে অনন্ত সিং এলেন লর্ড সিংহ রোডে—করলেন আত্মসমর্পণ। বললেন—চট্টগ্রামের অত্যাচারিত নরনারীর নিপীড়ন লাঘবের জন্য তাঁর এই আত্মসমর্পণ।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সন। পুলিশের গুপ্তচরেরা কোন এক সূত্রে চন্দননগরের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান পায়। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে টেগার্টের সৈন্যদল বাড়ি ঘেরাও করল। বিপ্লবীরা তখন সুপ্ত। জেগে উঠতেই তাঁরা দেখলেন বাইরে পুলিশ। তাঁরা জানালা ভেঙে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। শব্দ শুনে পুলিশ গুলি চালায়। জীবন ঘোষাল ওরফে মাখন নিহত হলেন। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত ধৃত হলেন।

৯ই অক্টোবর, ১৯৩০। চট্টগ্রামের এক গ্রাম থেকে অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী। এমনি করে চট্টল বিপ্লবের নায়করা

একে একে বন্দী হয়ে এলেন বৃটিশের কারাগারে।

শ্রীপুর গ্রাম। কুন্দপ্রভা সেনের আশ্রয়ে সেদিন সূর্য সেন বঙ্গদেশের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেক হত্যার পরিকল্পনা করেছেন। এর জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। তিনি শুধু মেধাবী ছাত্র নন —চরিত্রবান তরুণ। তাঁর মুখাবয়বে ছিল আদর্শ, নিষ্ঠা ও সাধনার ছাপ। চট্টগ্রামে বিপ্লবান্দোলনের প্রস্তুতির সময় বোমা প্রস্তুত কালে তিনি আহত হন। অস্ত্রাগার অধিকারে তাই তিনি যোগদান করতে অসমর্থ হন। ক্রেক হত্যায় তিনি যাত্রা করলেন।

১৯৩২ সন। ১লা ডিসেম্বর—শেষ রাত। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চাঁদপুর স্টেশন প্লাটফর্মে উপনীত হন। প্লাটফর্মে তখন চাঁটগাঁ মেল। মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সাহেবী পোষাকে বসেছিলেন রেল পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী—নাম তারিণী মুখার্জি। ক্রেক ভ্রমে বিপ্লবীদ্বয় এঁকেই হত্যা করলেন; পুলিশের হাতে রামকৃষ্ণ ও কালীপদ ধৃত হন। বিচারে অল্পবয়স্ক কালীপদের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের হ'ল ফাঁসির হুকুম। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯৩১ সনের মাঝামাঝি। সূর্য সেন তখন কানুনগোপাড়ায় গোপন আস্তানায় বসবাস করছেন।

বরমাগ্রামের দারোগাকে হত্যা করার পর বিপ্লবী তারকেশ্বর কানুনগোপাড়ার আশ্রয়কেন্দ্রে সূর্য সেনের সাথে যোগাযোগ করেন।

চট্টগ্রামের কারাগারের বিদ্রোহী বন্দীদের পলায়নের জন্য সূর্য সেন তখন পরিকল্পনায় রত। তারই রূপদানের ভার পড়ে তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সূর্য সেনের খোঁজ খবরের জন্য চলছে চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর তখন অকথ্য অত্যাচার। এ অত্যাচারের নায়ক চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আসানুল্লা। আসানুল্লা হত্যার জন্য সূর্য সেন নবদীক্ষিত বিপ্লবী চৌদ্দ বৎসরের কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্যকে নির্বাচন করেন।

১৯৩১ সাল—৩০শে অক্টোবর। নিজাম পল্টন খেলার মাঠে গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা আসানুল্লা হরিপদ ভট্টাচার্যের হাতের

রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। আসানুল্লার হত্যার প্রতিশোধ নিল পুলিশ। মুসলমান গুণ্ডা ছেড়ে দেয় তারা হিন্দু অধিবাসীদের উপর। হিন্দুর যথাসর্বস্ব লুট হয়। নারীদের উপরও অমানুষিক অত্যাচার হয়। বালক হরিপদর উপর চলে নির্মম নির্যাতন। বালক হরিপদ নির্বিকার। বিচারকের অবশ্য দয়া হল। হরিপদ নাবালক—তাই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হল না—হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের নির্দেশে শৈলেশ্বর রায়ের হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট এলিসন প্রাণ দিলেন এবং সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের হাতে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণো আহত হন।

১৩ই জুন, ১৯৩২। ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর গৃহে সূর্য সেনের তখন গুপ্তবাস। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কল্পনা দত্ত (ভুলু) ও প্রীতিলতা ওয়াদেদার (রাণী) এসেছেন সূর্য সেনের সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য। সহসা রাত্রি দশটায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বাড়ি ঘেরাও করল। বিপ্লবীদের সাথে ক্যামেরণের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ হয়।

কল্পনা ও প্রীতিলতা সহ সূর্য সেন পালাতে সক্ষম হন কিন্তু নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। অপর পক্ষে নিহত হন ক্যামেরণ।

১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য সেনের নির্দেশে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবে যে রক্তাক্ত কাহিনীর সৃষ্টি হয় তার অধি-নায়িকা ছিলেন প্রীতিলতা। ঐদিন মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী, প্রফুল্ল দাস সহ প্রীতিলতা রাত্রি দশটায় সাহেব-মেমদের সান্ধ্য মিলনের আড্ডা পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ করেন। পাহাড়তলী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই ক্লাব। এই ক্লাবের বহু সাহেব ও মেম এই শনিবারের সান্ধ্য-মজলিসে বিপ্লবীদের আক্রমণে আহত ও নিহত হন। কিন্তু প্রীতিলতা পটাসিয়াম সাইনেড গ্রহণ করতঃ আত্মহত্যা করেন।

সূর্য সেন তখন কাট্টলীর আস্তানায়। জৈষ্ঠ্যপুরা গ্রামের 'কুটীর আশ্রয়' ছেড়ে তিনি কাট্টলীর আস্তানায় তখন। এখান থেকে তিনি পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেন। ব্যাপক ইউরোপীয়ান হত্যার আর এক প্রচেষ্টা হয় ১৯৩৩ সনের ৭ই জানুয়ারী। সাহেবদের ক্রিকেট মাঠ, 'পলটন মাঠ'-এ হয় এ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য ও হিমাংশু ভট্টাচার্য

ঘটনাস্থলে মারা যান, আর কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তী পরে ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ দেন।

ধলঘাট থেকে তিন মাইল দূরে গৈরলা গ্রাম। গৈরলা গ্রামের বিশ্বাস বাড়িতে সূর্য সেন তখন পলাতক জীবন যাপন করছেন। বিশ্বাসবাড়ির সংলগ্ন সেনেদের বাড়ি। বড় ভাই নেত্র সেন পানাসক্ত, চরিত্রহীন। সে-ই থানায় খবর দিল।

১৯৩৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারী, রাত্রি দশটা। গভীর অন্ধকার। সূর্য সেনের সাথী সেদিন সুনীল দাসগুপ্ত আর কল্পনা। বাড়ির তিনদিকে সৈন্য। একদিক খালি। সেদিকে বেড়া। তার ওপর ঝোপের ভিতর বিশ্রী ময়লা গড়। সুশীল দাসগুপ্ত কল্পনাকে কোলে করে বেড়া পার করলেন। কিন্তু অন্ধকারে ময়লার গড়ের জলে পড়লেন কল্পনা। গড়ে উঠল জলের শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য করে একজন সৈন্য গুলি ছুড়ল। গুলি লাগল সুশীল দাসগুপ্তের হাতে। তাঁর দুই হাতের উপর তখন সূর্য সেনের দেহ। সুশীলের হাত থেকে সূর্য সেন পড়ে যান মাটির উপর। সূর্য সেন বেড়া পার হলেন। গড়ের দিকে নিরাপদ কিন্তু সেদিক লক্ষ্য করে সৈন্যরা ছুড়ছে গুলি। তখন সূর্য সেন গাছের গোড়া ধরে বেরিয়ে যেতেই এক গুর্খা সৈন্যের হাতে বন্দী হলেন।

তখন মধ্যরাত্রি—২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩। কারাগারে ফটক খুলল শৃঙ্খলিত চট্টল সিংহ সূর্য সেনের সামনে। কারাগারের বাইরে তখন কল্পনা ও তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা)। তাঁদের উদ্যোগে সূর্য সেনকে মুক্ত করবার দু দুটো পরিকল্পনা হয় কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ কর্মীরা সকলেই অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ, নবদীক্ষিত কিশোর বিপ্লবী। তিনমাস পর গহিরা গ্রামে কল্পনা ও তারকেশ্বর ধৃত হন। আশ্রয় দাতা পূর্ণ তালুকদার ও নিশি তালুকদার গুলির আঘাতে নিহত হলেন।

বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের হ'ল ফাঁসির হুকুম। কল্পনার হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। রাত্রিবেলায় সাধারণত ফাঁসি হয় না। সূর্য সেনের বেলায় তার ব্যতিক্রম হ'ল। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি হয়—১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী। কাল—মধ্যরাত্রি, ১২টা ৪০ মিনিট। ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার আগে সূর্য সেনকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। মৃতপ্রায় আহত সূর্য সেনকে ফাঁসি

দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় অত্যাচারে মৃত সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

চট্টল বিপ্লবের উপর নামল যবনিকা। তারই অন্তরালে ২রা জুন, ১৯৩৪-এ সহসা একদিন বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের প্রাণহীন দেহ নবদীক্ষিত এক কিশোর বিপ্লবীর উদ্যত অগ্নি-নালিকার গুলিতে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপরে। কর্ণফুলীর তীরে রাঙামাটির বুকে সেদিন জেগেছিল এমনি এক আগুন। সে আগুনে জাগে বঙ্গদেশ—কলকাতা, রাজসাহী, ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুর।

১৯৩০ সাল। লালদীঘি। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব। সাহেবের গাড়ির উপর বোমা পড়ল। অদূরে ফুটপাতের উপর শহীদ অনুজা সেন (খুলনা)-এর মৃতদেহ। টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা ফেলতে গিয়ে বোমার টুকরায় তিনি নিহত হন। খানিক দূরে তাঁর সঙ্গী দীনেশ মজুমদার (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) ধৃত হলেন।

ডাঃ নারায়ণ রায়ের ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায় বোমা তৈরীর মালমশলা। বোমা দিয়ে সাহেব মেমদের আড্ডা, হোটেল, রঙ্গালয়, দোকান উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। মামলা দায়ের হ'ল। মামলার নাম 'ডালহৌসি স্কোয়ার বোম্ব আউটরেজ' মামলা। দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। মেদিনীপুর জেল থেকে তিনি পালালেন।

চিত্রা বায়স্কোপের সামনে একটা বাড়িতে ছিল দীনেশ মজুমদার, হিজলী জেলের পলাতক বন্দী নলিনী দাস ও বিপ্লবী জগদানন্দ মুখার্জির গুপ্তবাস। ১৯৩৩ সনের জুন মাসের এক ঊষায় পুলিশের সহিত সংঘর্ষে তারা ধৃত হন এবং যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা হয়। আলিপুর দায়রা জজের এজলাসে বিচার হয়। আলিপুর আদালতে এক বিপ্লবীর রিভলবারের গুলিতে এর জন্য প্রাণ দিলেন আলিপুরের দায়রা জজ। বিপ্লবীর নাম কানাইলাল ব্যানার্জি—জয়নগর—মজিলপুরের ছেলে। যুবক বিষপানে আত্মহত্যা করেন।....

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বঙ্গদেশের লাট জ্যাকসন সাহেবের উপর গুলি চালান স্নাতকা বীণা দাস। লাট সাহেব রক্ষা পান। বীণা দাসের ন'বছর জেল হয়।........

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে হত্যা করে মারা যান বিমল দাসগুপ্ত।...

১৯৩২ সনের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনের উপর চলে আক্রমণ। জুন মাসে সেনহাটির অতুল সেন ওয়াটসনের উপর আক্রমণ করলেন। গুলি ব্যর্থ হয়। অতুল সেন বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

তারপর সেপ্টেম্বর মাসের একদিন সন্ধ্যায় ওয়াটসন যখন সস্ত্রীক দক্ষিণ কলকাতার দিক থেকে হাওয়া খেয়ে ফিরছিলেন তখন বিপ্লবীদের একখানা মোটর তাঁর মোটরের সামনে গিয়ে ধাক্কা দেয় এবং ওয়াটসন সাহেবের অচল মোটরের ভিতরে গিয়ে গুলি চালান চারজন বিপ্লবী। ওয়াটসন সাহেব, মেম ও ড্রাইভার রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে যান। তাঁরা সাংঘাতিকভাবে আহত হন।

তিনজন বিপ্লবী আত্মহত্যা করেন। চতুর্থ বিপ্লবী বিনয় রায় (মাদারিপুর) চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন। চন্দননগরে ফরাসী সরকারের একজন জাঁদরেল কর্মচারী তাঁর হাতে নিহত হন। কলকাতার বাইরে অবশেষে একদিন তিনি ধরা পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ছিল না। পুলিশের হাতে তিনি নজরবন্দী হন।....

রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত (ওরফে বাদল) ও দীনেশ গুপ্ত। এই আক্রমণে জেল সমূহের ইনস্‌পেকটর জেনারেল সিমসন সাহেব নিহত হন। সুধীর গুপ্ত বিষপানে আত্মহত্যা করেন। বিনয় বসু নিজের মাথায় রিভলবারের গুলি করেন। হাসপাতালে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার জন্য তিনি মাথার ঘা ঘেঁটে সেপ্‌টিক করে তোলেন এবং পরে মারা যান। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়।

রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের নায়ক বিনয় বসু ঢাকার বিপ্লবী। ঢাকা মিডফোর্ট হাসপাতালের সামনে ১৯৩০ সনে বিনয় বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের গুলিতে বঙ্গদেশের পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল লোমান সাহেব নিহত হন এবং ঢাকার পুলিশ সাহেব হড্‌সন গুরুতর ভাবে আহত হন। বিপ্লবীরা গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং একদিন দ্বিপ্রহরে সদলবলে বঙ্গদেশ সরকারের খোদ দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন।....

ঢাকার ছেলেদের হাতে আরও দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে। ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেনকে নিহত করে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরলেন কালিপদ

মুখার্জী। ঢাকা জয়দেবপুরের ছেলে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ব্যানার্জী ১৯৩৪ সনে দার্জিলিং-এ লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে বঙ্গদেশের অত্যাচারী লাট এণ্ডারসনের উপর গুলি চালান। অল্পের জন্য লাট সাহেব রক্ষা পান।

বিচারে উভয়ের ফাঁসির হুকুম হয়। ভবানী ১৯৩৫ সনের ২০শে মাঘ রাজসাহী জেলে আত্মদান করেন। রবীন্দ্র ও ভবানী শ্রীসঙ্ঘ এর বিপ্লবী।........

ঢাকার আই, বি'র পুলিশ সাহেব গ্রাসবি ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 'ডুর্ণো'র উপর এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার ক্যাসেলের উপর ময়মনসিংহে আক্রমণ হয়।

কুমিল্লায় সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেনস প্রতিযোগীদের নাম গ্রহণ করছেন। তের চোদ্দ বছরের দুটি মেয়ে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী সন্তরণে নামবার জন্য দুখানা আবেদন-পত্র রাখলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলের উপর। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মাথা নীচু করে আবেদনপত্র দুটো পড়ছেন তখন বালিকাদ্বয়ের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল এবং আরাম-কেদারায় লুটিয়ে পড়ল ম্যাজিষ্ট্রেটের দেহখানা। মেয়ে দুজন শ্রীসঙ্ঘের সদস্যা।....

কুমিল্লার পুলিশ সাহেব এলিসন-ও নিহত হন বিপ্লবীদের হাতে। আততায়ী ধরা পড়ে না। কুমিল্লা ও ঢাকার কার্যকলাপে শ্রীসঙ্ঘ, বি. ভি অর্থাৎ বেঙ্গল-ভলানটিয়ার্স দলের অবদান বেশী। বি. ভি. দলের দুঃসাহসিক কাজ ঘটে মেদিনীপুরে। তিন ম্যাজিষ্ট্রেট খুন—পেডি, ডগলাস, বার্জ। আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুরের কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার পণ করলেন বিপ্লবীরা। পরপর তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট খুন—পেডি, ডগলাস, বার্জ। রাজসাহী জেলের অত্যাচারী জেলর লিউক আহত হন ভোলানাথ কর্মকারের গুলিতে। ভোলানাথের বহু বৎসরের সশ্রম কারাবাস ঘটে।

পেডির হত্যাকারী প্রকাশ্য স্থান থেকে পালাতে সক্ষম হন। ডগলাসের হত্যাপরাধে প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। বার্জকে হত্যা করতে গিয়ে বিপ্লবীদের সাথে দেহরক্ষীদের সংঘর্ষ হয়। অনাথ বন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত নামক দুজন ছাত্র-বিপ্লবীর হাতে বার্জ নিহত

হন কিন্তু দেহরক্ষীদের গুলিতে নিজেরাও প্রাণ হারালেন। পরে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষের ফাঁসি হয়।

অসহযোগ আন্দোলন স্তব্ধ, কংগ্রেস নীরব। মহাত্মাজীর হাতে চরকা, মুখে হরিজন প্রেম। নূতন শাসনতন্ত্র চালু করবার আয়োজন করছে সরকার। সারা ভারতের সেদিকেই চোখ।

শুধু বঙ্গদেশে বলছে বিপ্লব। ১৯৩৪ সন পর্যন্ত বিপ্লব চলল প্রবল ভাবে। ১৯৩৭ সন পর্যন্ত চলল তার স্তিমিত গতি। শেষে কয়েক বছর চলে গুপ্তচর হত্যা, ডাকাতি আর ষড়যন্ত্র।

বঙ্গদেশের তিন হাজার রাজবন্দী বকসা দুর্গে, হিজলী আর বহরমপুর বন্দী শিবিরে বন্দী। নির্যাতন, দুর্ব্যবহার আর কুৎসিত পরিবেশে তাঁদের স্বাস্থ্য হয়ে আসে ক্ষীণ। চালু হয় নূতন পঁয়ত্রিশ সালের ভারত আইন। কারাগারের দরজা খোলে। বন্দীরা মুক্তি পান। এর পর আরম্ভ হল যুদ্ধ....দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্যলাভের এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চায় না কংগ্রেস।

স্বাধীনতা আগে...তারপর সহযোগিতা।

ইংরাজের কূট—চালকে ব্যর্থ করে স্বাধীনতা লাভের জন্য করে তারা লড়াই। ভারতের পথে পথে জাগে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। অদূর সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের পথে জাগে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি। ঘরে বাইরে নতুন বিপ্লব,—বলিষ্ঠ গণবিপ্লব। এই বিপ্লবের জেয়ারে আসে পরাধীনতার শিকল ভাঙবার শেষ ডাক।

এল ১৯৪২ সন। সারা ইউরোপ জার্মানের জয়োল্লাসে মুখরিত। বিজয়ী জাপান দেশের পর দেশ জয় করতে করতে ভারতের দিকে অগ্রসর হল। ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা পাবার জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্রিপস মিটমাটের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। ২২শে মার্চ থেকে ১৩ই এপ্রিল (১৯৪২) পর্যন্ত ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা চলল। আগের মত এও যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতিতে আর ভুলতে চান না ভারতের নেতারা। কংগ্রেস ও লীগ প্রত্যাখ্যান করল ক্রিপস প্রস্তাব। ক্রিপসের ফাঁদে গান্ধীজী পা দিতে চান না। সংগ্রাম ঘোষণা করলেন তিনি। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে তিনি তুললেন আওয়াজ—**ভারত ছাড়**।

ভারত ছাড় আন্দোলন

১৯৪২ সালের ৪ঠা আগষ্ট। কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করল। সেদিন শেষরাত্রিতে ভারতের সকল নেতা গ্রেপ্তার হলেন। ইংরাজ মনে করেছিল সংগ্রামের সুরুতে নেতাদের বন্দী করলে থেমে যাবে আন্দোলন কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। ইংরাজের গোয়াতুর্মিতে ক্ষুব্ধ জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হ'ল। নেতৃত্বহীন আন্দোলনে চারিদিকে জ্বলল আগুন। সেই আগুন—বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লব।

বিপ্লবের মূল কথা—সর্বতোভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন অস্বীকার। ভারত শাসন করবার নৈতিক অধিকার ভারতবাসী ছাড়া কারো নাই। গায়ের জোরে যারা ভারত শাসন করতে চায় আগষ্ট বিপ্লবীরা তাদের হুকুম করল—ভারত ছাড় (Quit India)।

গণমানবকে এ বিপ্লব আহ্বান দিল—'বিদেশীয় আইন অমান্য কর; শোষক-শাসনের প্রতীক থানা, কাছারি দখল কর;—তার উপর উড়াও জাতীয় পতাকা। প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করে নিজেদের শাসন ও বিচারের ভার নিজেরা গ্রহণ কর; অস্বীকার কর সর্বতোভাবে বিদেশী শাসন'। চলল সংগ্রাম ভারতের দিকে দিকে। সংগ্রামীরা ভাঙে আইন, চলে পিকেটিং মদের দোকানে, বিলাতী বস্ত্রের দোকানে। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে চলে সভাসমিতি ও বক্তৃতা। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কণ্ঠে জাগে ধ্বনি 'ভারত ছাড়'। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—করব, না হয় মরব। ছুটল মুক্তিপাগল মানুষদের দল। জাতীয় পতাকা নিয়ে চলে অসংখ্য নরনারীর শোভাযাত্রা। সৈন্যদের বুলেট বুকে করে অহিংস ভাবে তারা দখল করতে থাকে থানা—কাছারি। থানা, কাছারির উপর জাতীয় পাতাকা উড়ে। গ্রামে গ্রামে অচল বৃটিশ শাসন। বসে জাতীয় সরকার। মুক্তির স্বাদ পায় তারা। সৈন্য আসে, বুলেট চলে। অহিংস সংগ্রাম। রক্তে লাল হয় গ্রাম্যপথ।

ক্ষিপ্ত হয় জনতা। রেললাইন উড়িয়ে দেয়, পুল ভেঙে ফেলে, স্টেশনে আগুন লাগায়, মিলিটারি লরী পুড়ে ছাই হয়।

আগষ্ট বিপ্লবের অন্তরায় বঙ্গদেশে যতটা ছিল অন্য প্রদেশে ততটা

ছিল না। বিপুল সামরিক আয়োজন, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা বঙ্গদেশকে ছন্নছাড়া করল। তবুও বালিয়া, সাতারার মত বঙ্গদেশের মেদিনীপুরে সেদিন স্থাপন করল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন গ্রামরাজ্য। সীমান্তের মত বঙ্গদেশের মেদিনীপুর সেদিন দেখাল অহিংসার গৌরব। মেদিনীপুরের গৌরব ছাড়া বঙ্গদেশের গৌরব রক্ত-স্নাত কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীর আত্মাহুতি, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ধর্মঘট আর বালুরঘাট ও বীরভূমের চির মূক কৃষকদের অভ্যুত্থান।

১৩ই আগষ্ট (১৯৪২)। কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আসে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শোভাযাত্রা। অহিংস ছাত্রদের উপর চলল লাঠি। বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাম বাসে লাগায় আগুন, তার কাটে। চলে অনবরত গুলি। শ্রীমানী মার্কেটের কাছে আহত প্রথম শহীদ বৈদ্যনাথ সেনের পরদিন হাসপাতালে মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতার সাথে চলে পুলিশ আর সৈন্যের সংগ্রাম। যথেচ্ছাচার গুলিতে শতাধিক লোক মারা যায়—বেশীর ভাগ নিরপরাধ পথচারী লোক। সাতদিন কলকাতার সাধারণ জীবনযাত্রা বন্ধ হয়। এরপর আন্দোলনের গতি মন্থর হয়। প্রচারপত্র ও গোপন বেতার দ্বারা আন্দোলন জাগাবার চেষ্ঠা হয়। ডাক বাক্স ধ্বংস প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজ চলে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। জাপানী বোমা ও দুর্ভিক্ষের চাপে কলকাতা ও শহরতলীর আন্দোলন নষ্ট হয়।

পূর্ববঙ্গে ঢাকার আন্দোলন সবচেয়ে জোরালো হয়।

বীরভূমের বিদ্রোহী সাঁওতালরা বোলপুর স্টেশনে আগুন লাগায়। পুলিশ চালায় গুলি। সাঁওতালরা তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে।

বালুরঘাটের কৃষকরাও সরকারী ভবন আর কাগজপত্রে আগুন লাগায়। বঙ্গদেশের কৃষক, মজুর আর তরুণ-তরুণী আগষ্ট বিপ্লবে এনেছে এক নূতন ঐতিহ্য।

মেদিনীপুরে আরম্ভ হয় প্রথম 'থানা-অধিকার' আন্দোলন—২৮শে সেপ্টেম্বর ঃ তমলুক থানা-অধিকার। পুলিশের বুলেটে আহত কিশোর রামচন্দ্র বেরা গুলি-জর্জরিত দেহ থানার দোর গোড়ায় টেনে নিয়ে, "থানা দখল করেছি" এই কয়েকটি কথা বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। উত্তরদিক থেকে আসে আবার একটি শোভাযাত্রা। পুরোভাগে ৭২ বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা। বৃদ্ধার হাতে জাতীয়

পতাকা। দুটো গুলি এসে লাগল তাঁর হাতে। তবু বৃদ্ধা হাত শক্ত করে উঁচু রাখে পতাকা। আহতা মাতা মাতঙ্গিনী পুলিশ ও সৈন্যদের মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। প্রত্যুত্তরে তাঁর কপালে এসে লাগল গুলি। রক্তস্রোতের মধ্যে ঢলে পড়লেন জাতীয়-পতাকা হাতে মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর সাথে সাথে চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন উপেন্দ্র জানা, পূর্ণ মাইতি, রামেশ্বর বেরা, বিষ্ণু চক্রবর্তী, ভূষণ জানা, নগেন সামন্ত আর তিনজন কিশোর—লক্ষ্মী দাস, জীবন বেরা, পুরী প্রামাণিক।

পরদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর—মহিষাদল থানা অধিকার। মহিষাদল রাজার পাঠান দেহরক্ষীর গুলিতে দুজন শোভাযাত্রী নিহত হন। গুলি-বৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হয় জনতা। অসহনীয় গুলির মধ্যে থেমে যায় শোভাযাত্রা। সেদিনকার শহীদ—ভোলা মাইতি, সুরেন মাইতি, হরি দাস, পঞ্চানন দাস, যোগেন দাস, আশু কুলিয়া, সুধীর হাজরা, প্রসন্ন ভুঁইয়া, দ্বারকানাথ সাহু, গুণধর হাণ্ডেল, রাখাল সামন্ত, ক্ষুদিরাম বেরা। ঐদিন সুতাহাটা থানা অধিকার করে চল্লিশ হাজার লোকের এক জনতা। জনতা থানার লোকেদের বন্দী করে থানার অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করে এবং থানায় আগুন দেন। ঐদিন ঐভাবে পটাশপুর, খেজুরি ও ভগবানপুর থানা অধিকৃত হয়। কর্মচারীরা বন্দী হয় এবং পরে সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হয়।

পরদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর—নন্দীগ্রাম থানার পালা। ব্যর্থ হয় অভিযান। অভিযানে প্রাণ দেন আলাউদ্দিন, বিহারী করণ, পুলিন প্রধান, বিহারী হাজরা, পরেশ গিরি।

মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমা আগষ্ট বিপ্লবের পীঠস্থান। আগষ্ট আন্দোলনের প্রারম্ভে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হয় সভা আর হরতাল। ছাত্ররা ছাড়ল স্কুল-কলেজ, উকিল-মোক্তার ছাড়ল আদালত। চৌকিদার দেয় কাজে ইস্তফা, জনতা রাস্তাঘাট নষ্ট করে। থানা অধিকার করে। সরকারী নির্যাতন হয় চরম। গুলি চলে—মরে কত তরুণ, কত কিশোর। নারী-শিশুর উপর চলে অত্যাচার, আর হয় জরিমানা। চলে লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ। গ্রামের লোকদের জোর করে রাস্তার কাজে লাগান হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৪২) তারিখে এই নিয়ে গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে

পুলিশের তমলুকে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ চালায় গুলি। প্রাণ দেন তমলুকে ছ'জন—যামিনী কামনা, কুঞ্জ সিট, সর্বেশ্বর প্রামাণিক, চন্দ্র জানা, অনন্ত পাত্র, শ্যামানন্দ দাস। কাঁথিতেও জোর করে রাস্তা মেরামতের কাজে গ্রাম্য লোকদের লাগাতে গেলে গ্রাম্য লোকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। চৈতগড়ে পুলিশের গুলিতে মড়েন ১লা অক্টোবর তারিখে অমূল্য শাসমল, সুধীর মাইতি। ২১শে সেপ্টেম্বর বেলবনীতে গুলির মুখে প্রাণ দেন দশ জন। ২৯শে অক্টোবর ভগবান-পুরে প্রাণ দেন ষোল জন। ১৩ই অক্টোবর অলনাগিরিতে প্রাণ দেন দুজন। পটাশপুর থানায় অক্টোবর মাসে তিন দিনে গুলির মুখে প্রাণ দেন তিন জন।

আন্দোলনের মধ্যে কাঁথি-তমলুকের বুকে নামে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৬ই অক্টোবর ঝড়-বন্যা এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ। এই অমানিশার অন্ধকারে আগষ্ট বিপ্লবী কাঁথি-তমলুক নিশ্চেষ্ট ছিল না। অক্টোবর মাসে কেশবপুর থানার কেটুয়া গ্রামের লোকেরা পুলিশের হাত থেকে বন্দীদের মুক্ত করে এবং অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। আনন্দপুর থানায় সাবরেজিষ্টারি অফিসে আগুন লাগাতে গিয়ে জনতা পুলিশের সংঘর্ষে অনেক লোক প্রাণ হারায়—তন্মধ্যে ছিল একটি নারী ও দুটি শিশু। মোহনপুর এবং সবং থানায় চলে জনতার অভিযান।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'জনতার সরকার' তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। ঝড়-বন্যায় (১৬ই অক্টোবর—১৯৪২) দুর্গত মানুষের সেবা-কার্যের মধ্যে এই সরকার স্থাপিত হয় ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২। এই সরকারের জনপ্রিয় কার্যকলাপের ফলে দুবছর বৃটিশ সরকারের কোন অস্তিত্ব থাকে না। 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের' সৈন্য ও পুলিশ ছিল। ছিল গুপ্তচর বিভাগ। আর ছিল নিজস্ব কারাগার, আদালত ও আইনসভা। আদালতে চোর, ডাকাত ও দেশদ্রোহীদের দণ্ড হ'ত।

আগষ্ট বিপ্লবের আগুনে সর্বনাশা রূপ নিয়ে জেগেছিল মেদিনীপুর, কাঁথি ও তমলুক। সেই জাগরণ ধ্বংস করতে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অমানুষিক অত্যাচার সুরু হয়।

বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশ স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ১৯১৫ সনের সে ব্যর্থ বিপ্লবের কথা আমরা জানি। সুভাষচন্দ্র তখন কিশোর ছাত্র। সম্মুখে সংগ্রামের সেই প্রেরণার মাঝে

গড়ে উঠে তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাব ও রাজনৈতিক জীবন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই মেধাবী, প্রতিভাবান যুবক আই. সি. এস. চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী-ও অহিংসা আন্দোলনের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু আপোষ আর সংগ্রাম বিমুখতার বিরুদ্ধে তিনি সব সময় বিদ্রোহ করেছেন। বামপন্থী ভারত এসে দাঁড়াল তাঁর পিছনে।

১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসে ও ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচন হন। ১৯৩৯ সনে গান্ধীজীর সমর্থন না থাকায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক।' কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তাঁর উপর তিন বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করল।

বঙ্গদেশে তখন লীগ মন্ত্রীসভা। সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশ।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি 'হলওওয়েল মনুমেণ্ট' অপ—সারণের আন্দোলন সুরু করলেন। ১৯৪০ সনের ২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র ভারত-রক্ষা আইনে বন্দী হন। কারাগারে তিনি অনশনব্রত অবলম্বন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি গৃহে অন্তরীণ হলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনে তখন সারা ইউরোপ জ্বলছে। ব্রিটিশের শত্রুপক্ষের সহায়তায় ভারতের মুক্তি আনয়ন হ'ল সুভাষের স্বপ্ন।

অন্তরীণ অবস্থায় তিনি ইউরোপে পালাবার আয়োজন করলেন এবং অবশেষে ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষে একদিন তিনি ছদ্মবেশে বঙ্গদেশ ত্যাগ করলেন। কাবুলে পেঁছে তিনি সেখান থেকে মস্কো যাত্রার জন্য সচেষ্ট হ'লেন। সহসা তাঁর যাত্রাপথে খবর এল সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগদান করেছে। ইংরাজের বিপক্ষে তখন ইটালি, জার্মানি ও জাপান। সুভাষ চললেন বার্লিনের পথে। ১৯৪২ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবসে হামপসবারগে সুভাষ—'স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী' গঠন করলেন। এতে যোগ দিল মিশর ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বন্দী ভারতীয় সৈন্যরা। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সুভাষের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

এই সম-সময়ে মালয়ের বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে মোহন সিং গঠন করলেন 'ভারতীয় বাহিনী' কুয়ালালামপুরে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর আত্মসমর্পণ করল ইংরাজ ও অধীনস্থ পঞ্চাশ ষাট হাজার ভারতীয়

সৈন্য। খাদ্যাভাবের জন্য জাপানীরা তাদের মুক্তি দিল এবং মোহন সিং-এর হাতে সমর্পণ করল। ফারার পার্কের সভায় মোহন সিং এদের জাতীয় বাহিনীতে নিলেন।

কিছুদিন বাদে ব্যাঙককে প্রবাসী ভারতীয়দের অধিবেশন বসে। ব্যাঙককের এই সভায় গঠিত হ'ল 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ', 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী', 'আজাদ হিন্দ ফৌজ', "কর্মপরিষদ"। ফৌজের অধিনায়ক হলেন মোহন সিং, আর কর্মপরিষদের সভাপতি হ'লেন রাসবিহারী বসু।

রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনের বিপ্লব আন্দোলনের একজন কর্মী। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা ফেলবার ষড়যন্ত্রের মামলায় পুলিশ যখন তাঁকে খুঁজছিল তখন তিনি পালিয়ে চলে যান জাপানে।

চলে সংগ্রামের বিপুল আয়োজন। সেদিন ছিল চরম আঘাত হানবার সুবর্ণ-লগ্ন। ভারত সীমান্ত তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত কিন্তু স্বার্থপর জাপান অভিযানে উৎসাহ না দিয়ে 'আজাদ-হিন্দ ফৌজকে' নিজের কাজে লাগাতে চাইল। মোহন সিং অধীর হ'লেন।

রাসবিহারী বসু বললেন—সবুর করুন। দেখা যাক্।

এ নিয়ে দুই নেতায় মনোমালিন্য ঘটে। মোহন সিং ফৌজ ভেঙে দিলেন। জাপানীরা তাঁকে গ্রেফ্তার করল। ১৯৪২ সনের প্রারম্ভ থেকে ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আয়োজনই চলল—অভিযানের রূপ নিল না। সেদিন যদি অভিযান সুরু হ'ত—ইতিহাসের চাকা ঘুরে যেত। জাপানীদের কারসাজিতে আন্দোলন ব্যাহত হ'ল। অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা গেল। সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে এসে পেঁছালেন ১৯৪৩ সনের ২রা জুলাই তারিখে। মরা গাঙে আবার বান এল। ভারতীয়দের মধ্যে এল প্রবল উদ্দীপনা।

'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী'র সর্বকর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন সুভাষ। দলে দলে ভারতীয় যোগ দিল পুনর্গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে। মহিলারাও এসে যোগদান করেন। 'স্বাধীন আজাদ হিন্দ' সরকার স্থাপিত হ'ল।

সুভাষের মহান ব্যক্তিত্বে মানুষের মনের সকল দৈন্য ঘুচে গেল। সর্বস্ব পণ করে দেশের সেবায় দাঁড়াল এক লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসী। সুভাষের কণ্ঠের সাথে লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উঠল—'চল দিল্লী।'

১৯৪৪ সন। 'আজাদ হিন্দ' ফৌজ রেঙ্গুন পার হ'ল। আরাকানের

পাহাড়, জঙ্গল, নদী অতিক্রম করে এগিয়ে চলে ফৌজ। ১৮ই মার্চ তারিখে তারা ব্রহ্ম-সীমান্ত পার হয়ে এল ভারতের মাটিতে। কোহিমা দখল করে তারা ঘিরে ফেলল ইম্‌ফল—মণিপুরের রাজধানী।

১৮ই এপ্রিল। ভারতের পবিত্র মাটিতে উড়ল জাতীয় পতাকা। কোহিমায় বসল জাতীয় সরকার। মুক্তির স্নিগ্ধ হাওয়া ঢেউ তুলল পরাধীন ভারতের দোরে। মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী এখানেই থামে। এল প্রবল বর্ষা। দুর্গম রাস্তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য আসে না। রেঙ্গুনস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান ঘাঁটি থেকে জাপানের প্রতিশ্রুত বিমানও আসে না। ইম্‌ফলের অবরোধ তুলে পিছু হটল জাতীয় বাহিনী। সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনা—দিল্লীর পথে অভিযান এখানেই চিরতরে থেমে যায়।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সন। নাগাসীকি ও হিরোসিমায় এটম বোমা পড়ায় জাপান মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ হলেন। অনেকে বলেন যাত্রাপথে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, বৃহত্তম বিপ্লব সাধনায় কোথাও না কোথাও তিনি আত্মগোপন করে আছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাস। লালকেল্লার কাঠগড়ায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মুক্তি সংগ্রামের নায়ক শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলন বিচারকদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছেন। জাতির বেদনা আগুনের হলকায় ফেটে আসতে চায়। ২১শে নভেম্বর তারিখে কলকাতায় ছাত্ররা সেনানায়কদের মুক্তির দাবীতে শোভাযাত্রা বার করে। জনসাধারণও তরুণদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ ও সৈন্য ধর্মতলার মোড়ে শোভাযাত্রায় বাধা দিল। জনসাধারণ এগোতে চায়—পুলিশ এগোতে দিতে চায় না, কিন্তু ছাত্ররা নাছোড়বান্দা···তারা এগোবেই।

জনসাধারণের সেদিন অদম্য জেদ। নেতাজীর কাহিনী তাদের বুকে দিয়েছে অসীম বল। যুদ্ধান্তে সারা পৃথিবীতে এনেছে স্বাধীনতার আগ্রহ। সেই আগ্রহের ঢেউ এসেছে এদের অন্তরে। তারা অচল···· অটল! অগ্রসর হয় ছাত্রদল। সঙ্গে জনসাধারণ। গুলি চলল। জাতীয় পতাকা হাতে রামেশ্বর ব্যানার্জি কলকাতার রাজপথে চিরতরে ঘুমালেন। ঘুমালেন রামেশ্বর কিন্তু জাগল সারা কলকাতা। সারা রাত হাজার

হাজার, লক্ষ-লক্ষ ছাত্র নাগরিক জেদ ধরে পড়ে থাকে সেই রাজপথের উপর। তাদের কণ্ঠে ডালহৌসির নিষিদ্ধ অঞ্চলে চলবার আওয়াজ। বিক্ষুব্ধ জনতার উন্মত্ততায় পুড়তে থাকে বাস, ট্রাম। স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, দোকান পাট সব বন্ধ।…

সাম্রাজ্যবাদীর বুলেটের সামনে বহু প্রাণ বলি হয়। আব্বাস সালামের পিছু পিছু অনেক নিষ্প্রাণ দেহ মাটির ধূলি চুম্বন করল।

শিকল পূজার পাষাণ বেদীতে লাগল কাঁপন। সেদিন কলকাতায় তরুণদের পাগলামির আহ্বানে ক্ষেপে উঠল বঙ্গদেশ।

নূতন বছর। ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাস। লালকেল্লায় বিচার চলে। রসিদ আলি, সিঙ্গারা সিং আর ফতে খাঁর দণ্ডের প্রতিবাদে হিন্দু, মুসলমান ছাত্র ও নাগরিকদের শোভাযাত্রা উত্তাল করে কলকাতার রাজপথ। রক্তের হোলিরাগে চঞ্চল হ'ল সারা কলকাতা। বৃটিশ শাসকের সম্বল বেয়নেট। নবজাগ্রত ভারত ভয় করে না আর। জাগ্রত, নির্ভীক ভারতের বুকে জাগে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। মাঠে জাগে কৃষক, কলকারখানায় মজুর, শহরে শহরে জাগে তরুণ, কিশোর ও যুবক। জনসাধারণের মধ্যে এ বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ থাকে না। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর ভিতর। বোম্বাই সমুদ্র উপকূলে ভাসে 'তলোয়ার' জাহাজ। জাহাজের টেলিগ্রাফিষ্ট পি, সি, দত্ত জাহাজের দেয়ালে লিখে রাখেন "জয় হিন্দ" ও 'ভারত ছাড়'। এ লেখা অ্যাডমিরাল গডফ্রের চোখে পড়ল। পি, সি, দত্ত বরখাস্ত হলেন। নৌ-সেনানীরা বিদ্রোহী হয়। বোম্বাই পোতাশ্রয়ের জাহাজ বিদ্রোহী নৌ-সেনানীরা দখল করল।

নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই রাজপথে জাগল গণবিক্ষোভ। করাচীর সমুদ্রোপকূলে ও কলকাতার ডকে লাগল বিদ্রোহের ঢেউ। সেদিন সাধারণ মানুষের সে বিদ্রোহে দর্পী ইংরাজের সামরিক ও বিমান বাহিনী চঞ্চল হল। শোনিত সাগরে ভাসল দেশ। ইংরাজ শাসন হ'ল অচল। ভারত ছাড়বার জন্য তৈরী হ'ল বিদেশী শাসক।

ইংরেজের প্রশ্রয়ে ও সহায়তায় ভারত বিভাগের দাবী নিয়ে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে মুসলীম লীগ সুরু করল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। লীগ সরকারের সহায়তায় লীগের লোকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্তরালে হিন্দু নরনারীর উপর সুরু করল অত্যাচার। ভীতির দ্বারা কংগ্রেসকে

'পাকিস্তান' প্রস্তাবে অর্থাৎ ভারত-বিভাগে সম্মত করান এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য। সপ্তাহকালব্যাপী দাঙ্গায় কলকাতার রাজপথ হ'ল শবাকীর্ণ। দাঙ্গা ছড়াল নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে। নেতারা চিন্তিত হলেন। তাঁরা অগত্যা ভারত-বিভাগে সম্মতি দিলেন।

বেদনাদায়ক হত্যালীলায় বড়লাট ওয়াভেল নির্বিকার—অথচ এজন্য দায়ী তাঁর বিভেদ-নীতি। হিন্দু মুসলমান দেশপ্রেমিকদের বিক্ষোভের সীমা থাকে না। ওয়াভেলের বদলে মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতে এলেন।

কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত হ'ল। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ হ'ল।

রক্তারক্তিতে ছ'মাস অতিবাহিত হয়। দু'মাস মিটমাটে চলল।

অবশেষে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট, সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থান নিয়ে গঠিত হ'ল পাকিস্তান। আর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকে বাকী অঞ্চল। দেশীয় রাজ্যের বেশীর ভাগ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। এই দুই রাষ্ট্রের হাতে বৃটিশ শাসনভার অর্পণ করে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন সাফল্য লাভ করলেও ভারতবাসী আনন্দিত হতে পারেনি। ভারত-বিভাগ ইংরাজের শেষ অপকার্য—যার ফলে কোটি কোটি নরনারী ক্ষতিগ্রস্থ, আশ্রয়হারা। তবুও স্বাধীন ভারত আজও গৌরবের উচ্চ শিখরে।